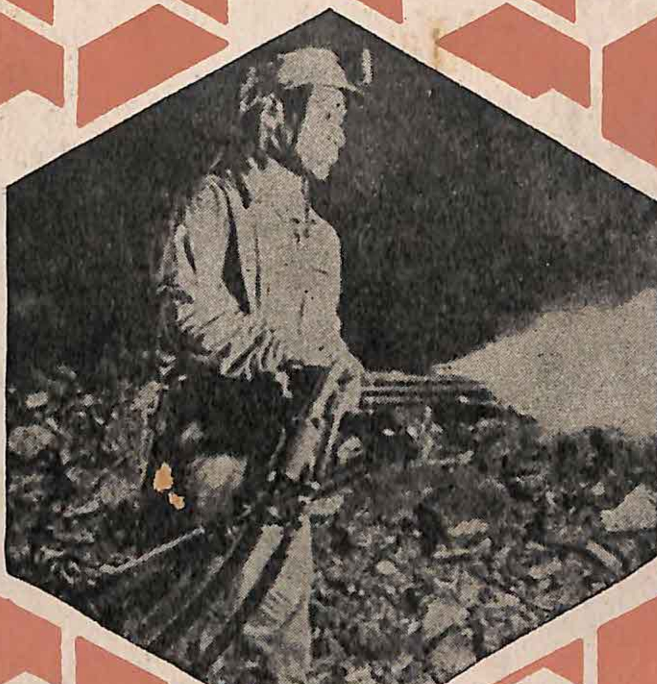
সন্ধান

সঙ্কর্ষণ রায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা



সন্ধান

সঙ্কর্ষণ রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SANDHAN

[SEARCAH FOR MINERALS]

SANKARSAN ROY

প্রকাশকাল—ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর :

রূপলেখা

২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : সাত টাকা

Published by Shri Sibnath Chatterjee, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

ভি, আর, খেদকর-এর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আমার ভূতাত্ত্বিক জীবনে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভারতের ভাণ্ডারে বিবিধ রতনের সন্ধান নিয়েছি। সন্ধানক্রমে বিচিত্র যে সব অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি, তাদের আংশিকভাবে তুলে ধরছি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে।

খনিজের জন্য সন্ধানকে মানুষের আদিমতম পেশা বলা যেতে পারে, কারণ সভ্যতার আদি থেকে মানুষ সোনা ও অন্যান্য খনিজ খুঁজছে। ভূবিজ্ঞানে জ্ঞানী হবার আগে থেকেই মানুষ খনিজ অনুসন্ধান করছে। তার মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ মানুষকে চিরকালই রোমাঞ্চিত ক'রে এসেছে। যারা আছে মাটির কাছাকাছি, মাটির তলায় উহ্য খনিজ সম্বন্ধে তাদের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি আছে। খনিজ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া এই অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন, কারণ নির্ভুলভাবে খনিজ-সঞ্চয়ের অবস্থান নির্ণয় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

মাটির নিচে চাপা পড়া খনিজ সম্পদ মাটির ওপরে নানাভাবে প্রকাশ পায়। তা দেখতে পায় তারাই, যাদের দেখার মত চোখ আছে। প্রকৃতি পাঠের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পর্যবেক্ষণশক্তিতে অবৈজ্ঞানিকরা অনেক সময় বিজ্ঞানীদেরও ছাড়িয়ে যান। বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য এবং রাজস্থানের মরু-অঞ্চলে এ জাতীয় অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমি স্থানীয় শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষের মধ্যে দেখেছি। খনিজের সন্ধানে তাদের অবদানের কথা লিখে তাদের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি।

সঙ্কর্ষণ রায়

॥ এক ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক পঠন-পাঠনে যখন রত ছিলাম, অধ্যাপকরা বলেছিলেন যে পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ বা ল্যাবোরেটারিতে পাথর বা খনিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যথেষ্ট নয়—প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে পাথরের ভাষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যাপকদের ইচ্ছামত আমি এলাম ঘাটশিলায়। ভূতত্ত্বের পাঠ নিতে শুরু করলাম ঘাটশিলার শিলায় শিলায়।

প্রথমে অনুসরণ করলাম সুবর্ণরেখা নদীর গতিপথ। শহরের দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত নদী মাটির আবরণকে অনাবৃত করে বিশ্লিষ্ট করেছে পাথরের স্তরকে। নদীর গতিপথকে আকীর্ণ করে আছে নানা আকারের পাথরের স্তূপ। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙে নিয়ে তাকে লেনস্ দিয়ে পরীক্ষা করি।

আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ পাথর। কোন দামই তার নেই। তুচ্ছ এক টুকরো পাথরমাত্র।

কিন্তু তার তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করে তাকে দেখতে গিয়ে দেখি যে সে খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার অন্তর্নিহিত জড় উপাদানগুলি স্থানীয় শিলাপটের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তখন বুঝতে পারি যে সামান্য পাথরের টুকরোটি স্থানীয় ভূপ্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ।

পাথরটি অভ্র, কোয়ার্টজ, গার্নেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সমাহার। তার ভূবৈজ্ঞানিক নাম মাইকা-সিস্ট (mica-schist)। মাইকা-সিস্ট নাম হলেও তার মধ্যে মাইকা, অর্থাৎ অভ্র বিরাজ করছে সূক্ষ্ম অবস্থায়।

আশেপাশে আর সব পাথরের স্তূপগুলোও মাইকা-সিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। দেখলে মনে হয় আলাদা আলাদা পাথরের ঢিবি, কিন্তু আসলে তারা একই মাইকা-সিস্ট-এর স্তরের অংশ। গোড়াতে এক এবং অবিভক্ত ছিল, কালক্রমে জলের ধারায় বিশ্লিষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নদীর স্রোতে মাইকা-সিস্ট ভাঙতে ভাঙতে বালির কণায় পরিণত হচ্ছে। একমুঠো বালি তুলে পরীক্ষা করে দেখি যে, তা মাইকা-সিস্ট-এরই ভগ্নাবশেষ। নদীর দুই তীরে ও গতিপথে যত না বালি জমছে, তার চেয়ে বেশি ভেসে যাচ্ছে জলের স্রোতে।

ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্র মোহনায়। সেখানে শেষ হচ্ছে ভেসে যাওয়ার পালা। তারপর শুধু সঞ্চয়। জমতে জমতে তৈরি হয়েছে বিশাল পলিমাটির স্তর—সমুদ্রের তীরে ধূ ধূ করছে আর একটি সমুদ্রের মত।

নদীর দুই তীর ছাপিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই মাইকা-সিস্ট-এর বালি। বালি গিয়ে মিশেছে মাটির স্তরে। বালিকণাগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে সৃষ্টি করেছে মৃত্তিকার স্তর। তারপর একটানা ঢেউ খেলানো মাটি উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড়গুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় মাটির ঢাকনা সরে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে পাথরের স্তূপ।

আমার মনে হল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর বাদে হয়তো এই বালি ও মাটির স্তর পাথরে জমাট বাঁধবে—পরিণত হবে বেলেপাথর ও কাদাপাথরের স্তরে। কাদাপাথরের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে মাইকা-সিস্ট—ভূগর্ভের তাপ ও চাপের ক্রিয়ায় আরও লক্ষ লক্ষ বছর বাদে কাদাপাথর হয়তো মাইকা-সিস্টে রূপান্তরিত হবে।

সুবর্ণরেখা নদীর ধারে এই যে মাইকা-সিস্ট এর মধ্যে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি, কোটি কোটি বছর আগে তারা বিরাজ করছিল পলিমাটির স্তর হিসাবে। অর্থাৎ কোটি কোটি বছর আগে এখান দিয়ে বয়ে যেত আর একটি নদী। সেই নদীর গতিপথে সঞ্চিত পলিমাটির পরিণতি ঘটেছিল কাদাপাথরে এবং কাদাপাথর রূপান্তরিত হয়েছে মাইকা-সিস্টে। কাদা-মাটির সঙ্গে বেলে-মাটিও জমেছিল। সেই বেলে-মাটি প্রথমে বেলে-পাথর, তারপর কোয়ার্টজাইটে (quartzite) পরিণত হয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরে কিছু দূরে কোয়ার্টজাইট-এর স্তর কতগুলো ছোট ছোট টিলার আকারে গালুডি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। কোয়ার্টজাইট-এর গায়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই কোটি কোটি বছর আগেকার নদীর প্রবাহের চিহ্ন। বহু কোটি বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই নদী, কিন্তু তার বেগের আবেগ চিরস্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই শিলাপটে।

মাইকা-সিস্ট ও তার সঙ্গে স্তরীভূত কোয়ার্টজাইট-এর বিন্যাস পরীক্ষা করে তাদের সুদূরপ্রসারী বিস্তারের আভাস পাই। মনে হয় যেন ঘাটশিলা ও তার চারপাশে এ দুটি শিলাস্তর ছাড়া আর কিছু নেই। উত্তর ও দক্ষিণের বনরাজিনীলা পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ভাবি, ও দুটো পাহাড়ও কী মাইকা-সিস্ট ও কোয়ার্টজাইট দিয়েই গড়া? কিন্তু সমতলভূমির পাশে পাহাড় তো চোখে চমক লাগাবার মত ব্যতিক্রম—পাথরের স্তরের বিন্যাসের মধ্যে কী তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি?

এ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে একদিন সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে চললাম দক্ষিণের

পাহাড়ের দিকে। আমার কাঁধে ঝুলছিল পাথরের নমুনা রাখার জন্য ঝোলা, পকেটে লেনস্, কোমরে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা ছিল কম্পাস এবং হাতে হাতুড়ি। চলতে চলতে মাটির আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করা পাথরগুলোকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে পরীক্ষা করি। একঘেয়ে কোয়ার্টজাইট ও মাইকা-সিস্ট-এর মধ্যে জায়গায় জায়গায় কালো রঙের পাথর দেখতে পাই। লম্বায় বড়জোর ত্রিশ মিটার। তা যেন মাইকা-সিস্টকে ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কালো পাথরের এক টুকরো পাথর লেনস্-এর সাহায্যে পরীক্ষা করি। আগ্নেয় শিলা। ভূগর্ভস্থ গলিত পদার্থ বা ম্যাগমা (magma) থেকে তার উৎপত্তি। মাইকা-সিস্ট-এর স্তরকে বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়েছে। কোটি কোটি বছর আগে এ অঞ্চলে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির অভ্যুত্থান ঘটেছিল—সেই সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সময় এর সৃষ্টি। কোটি কোটি বছর আগেকার ঐ অগ্নিপ্রবাহের স্বাক্ষর বহন করছে যেন তা।

চলতে চলতে আরও অনেক জায়গায় এই কালো পাথর চোখে পড়ল। বহু কোটি বছর আগেকার ঐ অগ্নিপ্রবাহ কতখানি ব্যাপক হয়েছিল তার প্রমাণ বহন করছে তারা।

পাহাড়ের কাছাকাছি শুরু হয়েছে শালবন। শালবন চিরে লাল কাঁকরে ছাওয়া সড়ক চলে গিয়েছে পশ্চিম থেকে পূব দিকে। সড়কটার শুরু পশ্চিমে টাটানগরে, পূর্বদিকে মোসাবনীতে তার শেষ। মোসাবনীতে আছে তামার খনি। শুনেছি, তামা ঐ খনির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামনের ঐ পাহাড় বরাবর বহু দূর পর্যন্ত, অর্থাৎ পূবে বহেরাগোড়া এবং পশ্চিমে চক্রধরপুরের কাছাকাছি ছুয়ারপুরম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পাহাড়ের মধ্যে পাথরের স্তর নাকি সম্পৃক্ত হয়ে আছে তামাযুক্ত খনিজ দিয়ে। তামার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু আছে। পাহাড় অবশ্য একটি নয়। একটির পর একটি অনেকগুলো পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পশ্চিম থেকে পূব দিকে বিস্তৃত হয়েছে।

টাটানগর-মোসাবনীর সড়ক পেরিয়ে যেতেই চড়াইয়ের আভাস পেলাম—পাহাড় শুরু হয়েছে এখানে। শালবনের ঘন আচ্ছাদনের দরুন পাহাড়কে পাহাড় বলে চেনা যায় না—বনই যেন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে ওপরের দিকে তাকালাম। বন ফুঁড়ে উঠেছে পাহাড়ের গোলাকার ছুঁচোলো চূড়ো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে তার মধ্যে চিহ্নিত ভূপ্রকৃতির সঙ্গে স্থানীয় ভূপ্রকৃতিকে মিলিয়ে দেখে বুঝলাম যে 'সিদ্ধেশ্বর' পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠছি আমি। ঘন বনের আচ্ছাদনে পাহাড়টা চাপা পড়লেও তার চূড়োটা নেড়া। চূড়োর ওপরে সাদা রঙের পাথর সূর্যের আলোয় মন্দিরের গম্বুজের মত ঝলমল করছে।

চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে পাহাড়ের গায়ে উদ্‌ভেদিত পাথরগুলো পরীক্ষা করি। সুবর্ণরেখা নদীতীর ও এই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে মাইকা-সিস্ট দেখেছি, তার সঙ্গে এই পাথরের মিল নেই। হাতুড়ি দিয়ে তার এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে তার মধ্যে ঘন কালো রঙের বায়োটাইট (biotite) ও সূক্ষ্ম কোয়ার্টজের দানা দেখতে পেলাম। পাথরটাকে ফিলাইট (phyllite) বলে মনে হল। ফিলাইটের পাশাপাশি কোয়ার্টজাইট-এর পিণ্ড আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ধারের কোয়ার্টজাইট-এর কোন মিল নেই। এই কোয়ার্টজাইট-এর মধ্যে কায়ানাইট (kyanite) নামে নীলাভ রঙের খনিজ ঝলমল করছে। ফিলাইট ও কোয়ার্টজাইট-এর সঙ্গে স্তরীভূত হয়ে আছে আর একটি পাথর। হাতুড়ি দিয়ে তাকে ভেঙ্গে তার ভেতরে বায়োটাইট-এর সূক্ষ্ম স্তরের ফাঁকে ফাঁকে গ্র্যানিট (granite)-এর ছোট ছোট স্তর চোখে পড়ল। ফিলাইট ও কোয়ার্টজাইট-এর মধ্যে ভূগর্ভ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা গ্র্যানিটকে যেন চাপ দিয়ে পিষে ফেলে ফিতের আকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গ্র্যানিটকে গ্র্যানিট বলে মনে হচ্ছে না, যেন মাইকা-সিস্ট-এর একটা ভিন্ন সংস্করণ। অর্থাৎ গ্র্যানিট-এর উপকরণ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার (feldspar) মাইকা-সিস্ট-এর মধ্যে ঢুকে এই পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলি সৃষ্টি করেছে।

যে প্রচণ্ড শক্তি গ্র্যানিটকে নিষ্পেষিত করেছে মাটির নীচে ভূগর্ভের তোলপাড় ছিল তার উৎস। বহু কোটি বছর আগেকার এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের স্বাক্ষর শুধু গ্র্যানিট নয়, তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত ফিলাইট ও কোয়ার্টজাইটও বহন করছে। তারা বহন করছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঙ্গনের চিহ্ন, যাদের লেন্‌স-এর সাহায্যে চিনে নিতে হয়। জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গনের স্থূল স্বাক্ষরও চোখে পড়ে। ভাঙ্গনের পথ বেয়ে ভূগর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইট (chalcopyrite), লোহাযুক্ত পাইরাইট (pyrite), পিরহোটাইট (pyrrhotite) প্রভৃতি। এই পাহাড় ও অন্যান্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রায় একশো মাইল অঞ্চল জুড়ে এমনি ভূগর্ভস্থ তোলপাড়ের স্বাক্ষর ও তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইট, পাইরাইট, পিরহোটাইট প্রভৃতি খনিজের সমাহরণ (concentration) বিরাজ করছে। চ্যালকোপাইরাইট এমনি বিপুল আকারে রয়েছে যে এই অঞ্চলকে বলা হয় সিংভূমের তাম্র অঞ্চল।

এই 'তাম্র-অঞ্চল' কিন্তু আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নয়। এর দিকে প্রথম নজর পড়েছিল তাম্রযুগের মানুষদের। তাম্রযুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ছ-সাত হাজার বছর আগে এখানে গড়ে তুলেছিল তারা তামার খনি। খনন করে তোলা তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইটকে গালিয়ে তার মধ্য থেকে তামা নিষ্কাশনও করত তারা। তাম্রযুগের

এই খনিবিদ ও ধাতুবিদদের স্মৃতি অস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে স্থানীয় কিংবদন্তীর মধ্যে।

সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে একটা সুড়ঙ্গের মুখোমুখী হলাম। এটা প্রাচীন খনিসুড়ঙ্গের মুখ, তাম্রযুগের তামার খনির অবশেষ। যাঁরা এই খনির মধ্যে ঢুকেছিলেন, প্রাচীন খনিবিজ্ঞানীদের নৈপুণ্য দেখে তাঁরা অবাক হয়েছিলেন। এমন নিখুঁত খনন নাকি আধুনিকতম যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও সম্ভব নয়।

এই সুড়ঙ্গের সামনে বিশেষজ্ঞরা খনি থেকে খনন করে বের করা তামার আকর ভেঙ্গে গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাথরের যন্ত্রপাতি পেয়েছিলেন। এগুলো নয়া প্রস্তরযুগের স্মারক, কাজেই তাম্রযুগের সূচনাকেও চিহ্নিত করছে। এই পাথরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছিল যে তাম্রযুগের আদিতেই এই খনি শুরু করা হয়েছিল।

এই খনির সঙ্গে সিংভূমের তামা অঞ্চলে আরও কয়েকটি খনি গড়ে উঠেছিল—অনেকগুলো গুহাসুড়ঙ্গ, এমন কি এখনকার দু একটি খনির মধ্যে তাদের চিহ্ন দেখা যায়।

কবে পর্যন্ত এই প্রাচীন খনিগুলো চালু ছিল তার সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া যায় না খুঁজে। এই সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের কাছাকাছি কুষাণ আমলের কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরেও যে খনিগুলো চালু ছিল তার প্রমাণ এই মুদ্রাগুলি। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত খনিগুলোতে কাজ চলত। তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

কেন বন্ধ হয়ে গেল তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত অশান্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া ভারতের তামার খনির ইতিহাসের ওপরে যবনিকাপাত করেছিল। খনিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগেরও অবসান হল যেন। সে যুগ আলোর যুগ, বিকাশের যুগ। তারপর এল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ—তা আচ্ছন্ন করল স্থানীয় লোকেদের। এখানে যে তামার খনি ছিল তা তারা ভুলেই গেল।

সামনের ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে প্রাগৈতিহাসিক খনিটাকে পরীক্ষা করব কিনা ভাবছি, এমন সময় কে একজন আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, কী করছ এখানে?

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিভূতিভূষণ। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার নেশার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এই গভীর অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়াবার দুঃসাহসও যে তাঁর আছে তা আমার জানা ছিল না। তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর মুখের দিকে।

মৃদু হেসে বিভূতিভূষণ বললেন, আমাকে দেখছ কী—যা দেখছিলে তাই দেখ ও আমাকে বল কি দেখছিলে তুমি।

ইতিপূর্বে আমার দাদার দাহিগোড়ার বাসাতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। আমি ভূতত্ত্বের ছাত্র জেনে আমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি এবং বলেছিলেন, ভূতত্ত্ব আমারও খুব ভাল লাগে—ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘাটশিলার মাটি পাথরের রহস্যকে চিনে নিই···

সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের পাথরের স্তরে প্রচ্ছন্ন রহস্যভেদের চেষ্টা করছি জেনে উৎসাহিত হয়ে উঠে বিভূতিভূষণ বললেন, সত্যিই ভারি রহস্যপূর্ণ এখানকার পাহাড়গুলো – এখানকার বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে আমারও মনে হয় কী একটা নিবিড় রহস্য এই পাহাড়গুলোকে আচ্ছন্ন করে আছে। আচ্ছা, এখানে পাথরের আড়ালে তো তামা আছে। তামা ছাড়া আর কিছু কী নেই এ পাহাড়ে? প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার খনির মধ্যে ঢোকার পথ তো এই সব সুড়ঙ্গ – তাই না?

—হ্যাঁ। তামা ছাড়া এখানে কায়ানাইট আছে। তাছাড়া আছে ফসফেট—ফসফেটযুক্ত খনিজকে বলে অ্যাপেটাইট।

—কায়ানাইট ও অ্যাপেটাইট ছাড়া আর কিছু কী নেই?

—তামাযুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইরাইটের সঙ্গে পাইরাইট ও পিরহোটাইট-এর মধ্যে নিকেল থাকার সম্ভাবনা···

—এসব কথা তো ডান সাহেবের বইয়েই পড়েছি। বাধা দিয়ে বললেন বিভূতিভূষণ, এই সব খনিজপদার্থ ছাড়া আর কিছু কী নেই—আর কিছুর খোঁজ কী ভূতাত্ত্বিকরা পাননি?

—বোধ হয় না। আমি জবাব দিলাম, আর কিছুর কথা কোন ভূতাত্ত্বিকই তাঁদের রিপোর্টে লেখেননি।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে থেকে বিভূতিভূষণ বললেন, আমার কী মনে হয় জান, আমার মনে হয়, এ পাহাড়ের রহস্যের পুরোপুরি সমাধান তোমরা করতে পারনি। যেসব খনিজ পদার্থের কথা বললে, সে সব ছাড়াও কিছু আছে পাহাড়ের আড়ালে—যা তোমরা দেখেও দেখছ না।

—কী করে জানলেন? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জেনেছি। বিভূতিভূষণ জবাব দিলেন, তোমরা যা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বোঝ, তা আমি সরাসরি আমার অনুভূতি দিয়ে টের পাই। এ পাহাড় ও এ পাহাড়ের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ আর সব পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে আমি স্পষ্ট

অনুভব করেছি যে বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব কিছু পাহাড়ের নীচেই আছে। জিনিসটা কী জানি না, তবে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলতে চলতে মাটির তলায় তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করেছে।

বিভূতিভূষণের মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমি। তিনি যা বললেন তা এমনি অবিশ্বাস্য যে আমার মুখে কোন কথা জোগায় না।

—আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বিভূতিভূষণ বললেন, কিন্তু এ আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিস—এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাক বা না থাক, এ সত্য। আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি কর—এ অনুভূতি তোমারও হবে…

কথা হল, আমার ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমায় বিভূতিভূষণ আমার সঙ্গ নেবেন এবং তিনি আমাকে এমন সব রহস্যের সন্ধান দেবেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নেই। তিনি বললেন, যে অনুভূতি আমাকে রোমাঞ্চিত করছে, তা তোমারও হবে। তবে একটা কথা, যে প্রকৃতির রহস্যভেদের জন্য তার মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করছ—তাকে ভালবাসতে হবে তোমাকে। 'ভালবাসায় পাথর গলে' এটা কথার কথা নয়—ভালবাসা দিয়ে সত্যিই পাথরকে জয় করা যায়। যে পাথরকে পরীক্ষা করছ, তাকে ভাল না বাসলে তাকে পুরো-পুরি বুঝতে পারবে না, তার রহস্যও পারবে না ভেদ করতে। এ কথা সবসময় মনে রেখ। শুকনো বিজ্ঞান দিয়ে প্রকৃতির হৃদয় জয় করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে দিন কয়েক বাদে বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমি এই তামার ক্ষেত্র এবং সিংভূমের বনক্ষেত্র পরিক্রমা করব। সেদিন দাহিগোড়ার লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে তাঁর কাছে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বললেন, মনে রেখ, দু'চার দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গী হব আমি।

আমার মনে ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে সেদিনের সেই আলাপের পর কয়েকদিন পরেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন বিভূতিভূষণ।

॥ দুই ॥

যে দুর্লভ সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি বিভূতিভূষণ দিয়েছিলেন আমাকে, তা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু ঘাটশিলার পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বর ও আর সব পাহাড়ে পর্যটনকালে তা যেন অদৃশ্য পার্শ্বচরের মত ঘিরে থাকে আমাকে।

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবি, বিভূতিভূষণ কোন্ রহস্যের আভাস পেয়েছিলেন এই সব পাহাড়ের আড়ালে ? তাঁর সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পাহাড়ের পাথরের স্তরের অন্তরালে কোন্ পরম বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ?

বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন খাঁটি প্রকৃতি-প্রেমিক। প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন যে প্রকৃতি-সম্পর্কিত তাঁর অনুভূতিকে সাহিত্যের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সিংভূমের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করার সময় তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চারিত অনুভূতি তিনি তাঁর দিনলিপির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই সব দিনলিপির কয়েকটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই দিনলিপি-গ্রন্থগুলো পড়ে আমি তাঁর অনুভূতি-গুলোকে বোঝার চেষ্টা করি ঃ

"চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোটবড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে···একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো···"

"এমন বনস্পতিশ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত দর্শন শৈলশ্রেণী—দুয়ের এই যোগাযোগই এই অরণ্যকে অধিকতর রহস্যময় করেছে।"

"গভীর অরণ্যে নদীর অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও পাখির কূজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্য বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস।······জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত কোন মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর ···জয় হোক সে দেবতার···।"

"...এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে।···সুবর্ণরেখার পারের সূর্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুংরি পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত···"

"দূরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম আরও নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা—বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব।…কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরু ঝর্ণায় শিখী নৃত্য—জ্যোৎস্না রাত্রে শিলা-খণ্ডে ময়ূর-ময়ূরীদের নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরা বাস করেন এ বনে…"

"উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে—চারপাশে ঘন বনানী, পাথরের ধসে পড়া চাঁই।…জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যুগযুগান্তরের বাণীর মত।…উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও মাটির ক্ষয়িত পর্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বনস্পতি। ছায়া পড়েছে মেঘের—অন্য কোন শব্দ নেই শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ্য আর বনবিহঙ্গকাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এই কোয়ার্টজাইটের চাঁই, বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা…এরাই বড়।"

"…শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় মনের গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, একে তো নির্জন…রাতে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক নাকি এদিকে থাকে না বেশি রাত্রে।…সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জনতা ও নৈশব্দ্যের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্যন্ত।"

"এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে দূরবর্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জল-পতনধ্বনি ও দু-একটা নৈশপাখির কূজন দ্বারা বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয়মন জয়ধ্বনি করে উঠল সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে! মুখে কিছু বলা যায় না…এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ও বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠেছে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌছে দিচ্ছে…"

পাহাড় ও অরণ্য কথা কয়েছিল বিভূতিভূষণের কাছে—শুনেছিলেন তিনি মূকধরণীর মৌন সঙ্গীত। "অনন্তের যে মৌন ইতিহাস আঁকা আছে পাথরের স্তরে স্তরে" তার আভাসও পেয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বর ও তার দু-পাশের শৈলশ্রেণীতে বিচরণের সময় একটা গভীর গহন অপূর্ব রহস্য তাঁর অনুভূতিকে রোমাঞ্চিত করেছিল। কিন্তু বন্যপ্রকৃতির এই রহস্যাবরণ উন্মোচন করে পাথরের স্তরে স্তরে উৎকীর্ণ "অনন্তের মৌন ইতিহাস"-এর পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিনা সে কথা কোথাও লিখে যাননি তিনি।

সিদ্ধেশ্বর ডুংরির (পাহাড়) পশ্চিমে রোয়াম, তার পাশে তামা পাহাড় ও যাদুগুডা পাহাড়, পূর্বদিকে চাপরি, পূর্ণপানি, স্বর্দা প্রভৃতি অনেকগুলো পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলাম পাহাড়ের পাথুরে হাড়-পাঁজর। ফিলাইট, কোয়ার্টজাইট ও গ্র্যানিটের পাশাপাশি নিবিড় কালো আর একটি শিলাস্তর দেখলাম, ব্যাসল্টের পরিবর্তিত রূপ। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত লাভা ব্যাসল্টে জমাট বাঁধার পর ভূগর্ভের চাপে রূপান্তরিত হয়েছে এপিডায়োরাইটে (epidiorite)। ফিলাইট ও কোয়ার্টজাইট-এর স্তর এই দুটি আগ্নেয়শিলা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইট, অ্যাপেটাইট (apatite), কায়ানাইট, ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি খনিজে সম্পৃক্ত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ আলোড়ন আগ্নেয়শিলার মূল থেকে টেনে এনেছে এই সব খনিজযুক্ত তরল পদার্থ।

এইসব খনিজ পদার্থ ছাড়া অন্য কোনও খনিজের কোন চিহ্নই দেখতে পাইনে। যা আমাদের অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিকদের চোখে পড়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন জিনিস এখানে প্রচ্ছন্ন থেকে বিভূতিভূষণের অনুভূতিকে রোমাঞ্চিত করেছে কি না তার কোন হদিসই পাই না।

হদিস না পেলেও হতাশ হই না, খুঁজেই যেতে থাকি। খুঁজে না পেয়ে বেড়ে যেতে থাকে আমার খোঁজার নেশা। প্রায় উন্মত্তের মত খুঁজে বেড়াই। আমার হাবভাব দেখে স্থানীয় লোকেরা মনে করে বুঝি আমি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।

আমার কাজ দেখার জন্য আমার অধ্যাপক এলেন কলকাতা থেকে—আমার এই অকারণ অনুসন্ধানের নেশা তাঁকে বিস্মিত করে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ব্যাপার কী বলো তো! কী খুঁজছ তুমি অমন করে?

উত্তরে সব কথা খুলে বলতে তিনি হেসে উঠলেন হো-হো করে। হাসতে হাসতে বললেন, একজন কথাসাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এতখানি গুরুত্ব দাও কী করে!

—বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে আমি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করিনে স্যার। সত্যিই এমন সব জিনিস প্রকৃতির বুকে লুকোনো থাকতে পারে, যেগুলো আমরা চোখেও দেখতে পাইনে।

—অদৃশ্য বস্তুর কথা বলছ! অধ্যাপক ঠাট্টার সুরে বললেন। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর মুখ। পাথরের মত জমাট বাঁধা গলায় তিনি বললেন, সর্বদা মনে রেখ যে তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, একজন সাহিত্যিকের কল্পনা দিয়ে চালিত হলে তোমার ক্ষতি হবে।

আমি বললাম, কল্পনা নয় স্যার, এটা ওঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি। প্রকৃতিকে উনি ভালবাসতেন, আমার ধারণা এখানকার বন-পাহাড় ওঁর সঙ্গে কথা কইত। ওঁর অনুভূতিকে অবৈজ্ঞানিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলে বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন, বুঝেছি বিভূতিবাবু তোমার ওপরে এমনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন যে তোমার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তাতে। তোমার এই স্বপ্নঘোর থেকে তোমাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চল আমার সঙ্গে।

– কোথায়?

—কঠিন বস্তুজগতে—যেখানে কবিসুলভ কল্পনার কোন ঠাঁই নেই, কল্পনার পাখায় সওয়ার হলেই মাথার ওপর লোহার পাথরের চাঁই এসে পড়বে···

অধ্যাপকের অনুরোধমত টাটা কোম্পানির একটা জীপ এসেছিল টাটানগর থেকে—তাতে করে রওনা হলাম আমরা চাইবাসার দিকে। চাইবাসা শহরে না ঢুকে শহরের পাশ কাটিয়ে চললাম দক্ষিণদিকে। ঢেউ-খেলানো লাল কাঁকরে ছাওয়া প্রান্তরের বুক চিরে কালো ফিতের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়েছে কেওনঝরগড়-এর সড়ক। আশে-পাশে ডলারাইট (dolerite) পাথরের কালো রঙের ঢিবি অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কালের মত পড়ে আছে। প্রায় সমতল লাল মাটির ফাঁকে ফাঁকে গ্র্যানিটের আভাস পাই।

প্রান্তরের প্রান্তে অরণ্যের আভাস। ঐ অরণ্য লক্ষ করে যাচ্ছি আমরা। পেরিয়ে যাই সিংভুম জেলার সীমান্ত। ওড়িশার কেওনঝর জেলায় বড়বিল নামে একটি শহরে পৌছলাম। আশেপাশে অনেকগুলো লোহার ও ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে—সেই সব খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহর। নাম বড়বিল—কিন্তু কাছাকাছি কোন 'বিল' বা জলা চোখে পড়ল না।

বড়বিল থেকে টকটকে লাল মাটির পথ ধরে এগিয়ে যাই। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের গাছপালার সবুজ রঙ লাল মাটির রক্ত রঙে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাটির এই রক্ত-রঙের উৎস হল লোহা। লোহার পাথর থেকে অক্সিজেনের ক্রিয়ায় লোহা ক্ষয় হয়ে সৃষ্টি করেছে রক্তাভ লোহাযুক্ত অক্সাইড, তা লোহার পাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিকে দিয়েছে রাঙিয়ে।

লালমাটির ওপরে রক্ত-রঙিন ধুলোর ওড়না উড়িয়ে জীপ ছুটে চলে ঘন বনাবৃত পাহাড় লক্ষ করে। কাছেই পাহাড়—এই রক্ত-রঙিন প্রান্তরই যেন ভূগর্ভস্থ আলোড়নের ফলে পাহাড়ের আকার নিয়েছে। ঘন বনের আচ্ছাদনের দরুন পাহাড়টাকে নীলাভ দেখাচ্ছে। পাহাড়ের মাথাটা অনাবৃত—গাছপালার আবরণ ভেদ করে অনাবৃত হয়েছে রক্তবর্ণ লোহার পাথর, যেন পাহাড়ের মাথায় কেউ ছোরা বসিয়ে তার ভেতরকার মাংস-পেশীগুলো বের করে এনেছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠেছে ওপরের দিকে—সেই রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে আমাদের জীপ। উত্তুঙ্গ পাহাড়ের পুরোটাই লোহার পাথর দিয়ে গড়া। প্রকাণ্ড লোহার পাথরের স্তূপ পাহাড়ের আকারে জমাট বেঁধে আছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে পাহাড় কেঁপে ওঠে। পাহাড়ের সঙ্গে আমাকেও কেঁপে উঠতে দেখে অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন, ভয় নেই, খনিতে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে "আয়রন ওর (ironore)" ফাটানো হচ্ছে।

—খনি ! আমি চমকে উঠলাম : এই বনের মধ্যে জনমানুষের কোন চিহ্ন নেই—খনি কোথায় ?

—খনি আছে পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের তলা থেকে কিছু বোঝার জো নেই—ওপরে উঠলেই দেখতে পাবে কিভাবে এই পাহাড়টাকে কেটে কেটে লোহার পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সত্যিই তাই। পাহাড়ের শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছতেই পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে লোহার পাথর খননের ব্যাপক আয়োজন দেখতে পেলাম। পাহাড় ভেঙে বের করা হচ্ছে লোহার পাথর "হেমাটাইট (hematite)"—তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে জমিয়ে রাখা হচ্ছে একটি চালাঘরের মধ্যে।

খনির ওভারম্যান আমাদের নিয়ে গেলেন খনির বিভিন্ন জায়গায়। লোহার পাথর দিয়ে গড়া পুরো পাহাড়টাই খনন করার আয়োজন করা হয়েছে। খনন চলছে ধাপে ধাপে—অতিকায় আকারের ধাপ কাটা হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। খনির ওভারম্যান আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে পাহাড়ের গায়ে এমনি ধাপ কেটে কেটে খনন করাকে বলে "টেরেসড মাইনিং" (terraced mining)।

খনি দেখা শেষ হলে পর ওভারম্যানকে আমি অনুরোধ করলাম, দু-একটি হেমাটাইট-এর নমুনা উপহার দিতে আমাদের।

ওভারম্যান বললেন, দু-একটা কেন, দুশোটা দিতে পারি।

অধ্যাপক বললেন, না, না, অত বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কয়েকটা দিন, ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব।

—আসুন আমার সঙ্গে, নিজেরাই বেছে নেবেন আপনারা।

বলে খনির পাশে চালাঘরের দিকে চললেন ওভারম্যান। তাঁকে অনুসরণ করে চালাঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি যে, খনি থেকে ভেঙে আনা হেমাটাইট-এর স্তূপের দুধারে সারি দিয়ে বসে আছে প্রায় চল্লিশজন আদিবাসী মেয়ে। হেমাটাইটের টুকরোগুলোকে

ভাগে ভাগে সাজিয়ে ফেলছে তারা—দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদের গুণানুসারে সাজাচ্ছে।

ওভারম্যান বললেন, এগুলো দেখে হয়তো আপনাদের মনে হচ্ছে যে, এদের মধ্যে কোন তারতম্য নেই—তাই না?

—হ্যাঁ। অধ্যাপক জবাব দিলেন, একই রকম শক্ত কালো পাথর—চোখে দেখে এদের মধ্যে লোহার পরিমাণের কোন তারতম্য আছে ব'লে মনে হয় না।

—কিন্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে শতকরা দশ ভাগ পর্যন্ত লোহার পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। খালি চোখে দেখে আমরা তা বুঝতে না পারলেও এই আদিবাসী মেয়েরা ঠিক বুঝে নেয়। এই দেখুন না, এরা কি রকম অনায়াসে লোহার পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী পাথরগুলোকে ভাগ করে ফেলছে।

—আপনাদের তা হলে কেমিস্টের দরকার হয় না! আমি বলে উঠলাম।

—দরকার হয় না তা নয়। ওভারম্যান জবাব দিলেন, কারণ কেমিক্যাল টেস্ট-এর রিপোর্ট না দিলে গ্রেড ঠিক করা যায় না। কিন্তু কেমিস্টের কাজ সহজ করে দিয়েছি এই মেয়েরা। টেস্ট করার আগেই কেমিস্ট বুঝে যান লোহার পরিমাণ শতকরা কত হবে।

—আশ্চর্য ব্যাপার। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু কী করে বোঝে ওরা?

—তা জানি না। ওদের প্রশ্ন করলে ওরাও পারবে না বলতে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, আমার মত আমার অধ্যাপকের চোখ দুটিও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

—বলুন স্যার, এর কী ব্যাখ্যা? আমি অধ্যাপকের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কী করে আদিবাসী মেয়েরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করছে।

—আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। অধ্যাপক ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন।

আমি বললাম, আপনার কী মনে হয় না স্যার যে মাটির কাছাকাছি আছে বলে এরা পাথরের ভাষা বোঝে! আমাদের কাছে পাথরগুলো বোবা, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা কয়······তাই পাথরগুলোকে ছুঁয়েই তাদের গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারে ওরা······

—হয়তো তাই। অধ্যাপক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, কিন্তু ওদের এই ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন ভূবিজ্ঞানীই দিতে পারবেন না।

—ব্যাখ্যা দিতে না পারুন, ব্যাখ্যার অতীত এই ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই তাঁরা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবেন না।

—নিশ্চয়ই না। চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—তা হলে বিভূতিভূষণের ব্যাপারটাকেও আমি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিই কী করে বলুন! এই আদিবাসী মেয়েদের মতই প্রকৃতির সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল—বন পাহাড় যেন তাঁর সঙ্গে কথা কইত। ঘাটশিলার দক্ষিণের পাহাড়গুলির মধ্যে যে রহস্যময় কিছু লুকোনো আছে তা তিনি তাঁর সমস্ত শরীর মন দিয়ে অনুভব করতেন। এই আদিবাসী মেয়েদের ক্ষমতাকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি তাঁর অনুভূতিকেও আমি অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

অধ্যাপক আমার কথার ওপরে কোন কথা না বলে চালাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

তাঁকে অনুসরণ করে চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি যে তিনি একদৃষ্টে একটি অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, দেখছ তো "আয়রন ওর"-এরই পাহাড়, পুরো পাহাড়টাই লোহা দিয়ে গড়ে উঠেছে, বিস্ময়কর নয় কী!

অধ্যাপকের মুখের ভাবে বুঝতে পারি যে, আদিবাসী মেয়েদের বিস্ময়কর ক্ষমতা, বিভূতিভূষণের অলৌকিক অনুভবশক্তির অস্বস্তিজনক প্রসঙ্গকে চাপা দিতে চাইছেন তিনি। মনে মনে হাসলেও মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে আমি বললাম, ঠিকই বলেছেন স্যার—রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু এই আশ্চর্য ব্যাপারটি সম্ভব হল কী করে?

অধ্যাপক বললেন, এই সব লোহার পাথর যাঁরা পরীক্ষা করেছেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর তাঁদের বইয়ের মধ্যে পেয়ে যেতে পার। তবে আমি যতদূর জানি, নানা মুনির নানা মত—লোহার পাহাড়ের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে অনেকে অনেক রকম আলোচনা করলেও তার চূড়ান্ত মীমাংসা আজও হয়নি।

আমি বললাম, লোহার পাহাড়ের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একজনের লেখা থেকে খানিকটা টুকে রেখেছি আমার নোটবইয়ে—পড়ে শোনাব স্যার?

—কার লেখা? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক, জোনস্ না ডান্?

—জোনস্ বা ডান্ নয় স্যার, আর একজন। বাংলায় লেখা, বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় তিনি লিখতেন না।

—কে তিনি—কি তাঁর নাম?

—আগে শুনুন—নাম পরে বলছি।

—বলে পকেট থেকে নোটবই বের করে আমি পড়তে শুরু করলাম :

"সৃষ্টির আদিম যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরি হয়েছিল, কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল······এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় পর্বতাকারে জমাট বাঁধা······কোন প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে······"

—চমৎকার। আমার মুখের ওপরে প্রদীপ্ত দৃষ্টি হেনে অধ্যাপক বললেন, লোহার সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে এমন সংক্ষেপে এত সুন্দর করে বোধ হয় কেউই লেখেননি। কার লেখা এটা ?

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমি জবাব দিলাম।

স্তম্ভিত অধ্যাপক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর অভিভূত কণ্ঠে তিনি বললেন, ভূবৈজ্ঞানিক না হলেও বিভূতিভূষণের বোধ হয় ভূবিজ্ঞানে সহজাত জ্ঞান ছিল···

আমি বললাম, প্রকৃতিকে ভালবাসতেন বলে প্রকৃতির সঙ্গে সহজ আদান-প্রদান ঘটত তাঁর। যা কিছু আমরা ভূতত্ত্বের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করছি, তিনি সোজাসুজি বুঝে নিতেন—

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অধ্যাপক বললেন, হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি। বিভূতিবাবু যা অনুভব করেছেন, তাকে বোঝার চেষ্টা করলে হয়তো বহু অজ্ঞাত রহস্যের মীমাংসা করতে পারবে···

॥ তিন ॥

বিভূতিভূষণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বন-পাহাড়ের মধ্যে আমার পরিক্রমায় আর আপত্তি করেন না আমার অধ্যাপক। বিভূতিভূষণের অনুভূতির মধ্যে প্রাকৃতিক রহস্য যে অনির্বচনীয় ঝঙ্কার তুলেছিল, তাতে সুর মেলাতে উৎসাহিতই করতে শুরু করেন তিনি আমাকে। ঘাটশিলা ত্যাগের আগে তিনি আমাকে বললেন, এখানকার বন-পাহাড়ের রহস্যের ঢাকনা সরিয়ে যে সত্যের সন্ধান বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, চেষ্টা কর তাকে খুঁজে বের করতে···

অধ্যাপকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, বিভূতিবাবুর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে তা হলে আপনি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করছেন না ?

—না। অধ্যাপক জবাব দিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে ভূ-বিজ্ঞানকে বেঁধে রাখা যে কতোখানি ভুল তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। বিভূতিবাবুর সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, কাজেই প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে বিজ্ঞানের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল তা আমি এখন বুঝতে পারছি···

অধ্যাপকের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে নতুন উদ্যমে বিভূতিবাবুর প্রিয় জায়গাগুলোতে আমি পর্যটন শুরু করলাম।

সিদ্ধেশ্বর ডুংরি, চাপরি, তামাপাহাড় প্রভৃতি বননীল শৈলশ্রেণী একটানা প্রসারিত হয়েছে সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র বরাবর। একটার পেছনে একটা, তার পেছনে আর একটা, থই থই করছে শুধু পাহাড়। পাহাড়ের তলায় বন বিভাগের রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে একদিন যাদুগুড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। বনের মধ্যে রাস্তা এমনি ডুবে গেছে যে, তাকে পায়ে পায়ে চিনে নিতে হয়। বড় বড় শাল, আমলকি, করম, বীজা, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ, চিহোড়, আতগুী প্রভৃতি লতার জটিল জালে আচ্ছন্ন হয়ে বনকে দুষ্প্রবেশ্য করে তুলেছে। পথ এখানে একটা সুঁড়িপথের আকারে এঁকে বেঁকে পাহাড়কে বেষ্টন করেছে। এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যেও বুঝতে পারছিনে কোথায় এসেছি।

এক জায়গায় একটা কাঁটাবনের পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার পাশের লতাঝোপটা নড়ে উঠল।

বাতাস বইছে না, গাছের পাতাগুলো সব নিস্পন্দ হয়ে আছে। বনময় স্থিরচিত্রের মধ্যে এই হঠাৎ আলোড়ন আমার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে তুলল। বোধ হয় কোন বন্য জন্তু ওত পেতে আছে ওখানে। থমকে দাঁড়াই। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই আত্মরক্ষার জন্য। ছুটে পালানো বা গাছে চড়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় নড়ে ওঠা লতাঝোপটি একটি মানুষের আকার নিল।

খাকী পোশাক-পরা লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি যেন মূর্তিমান বনদেবতা। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে যৌবন যেন উপচে পড়ছে। তাঁর কাঁধে রাইফেল ও ক্যামেরা, হাতে পাথর ভাঙার হাতুড়ি এবং কোমরের চামড়ার বেল্টে লাগানো বুলেটের ব্যাগ ও 'ব্রাণ্টন্' কম্পাস। তাঁর সঙ্গে আছে একজন সাঁওতাল যুবক। তার পরনে খাটো কাপড়, এক হাতে টাঙ্গি ও অন্য হাতে বাক্সের আকারের কী একটা যন্ত্র। সে বোধ হয় এই খাকী পোশাক-পরা ভদ্রলোকটির পথপ্রদর্শক।

—হ্যালো জিয়োলজিস্ট। আমার কাঁধে হাত রেখে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন এই ভদ্রলোক, কী করছ তুমি এই সাংঘাতিক জঙ্গলের মধ্যে? সঙ্গে বন্দুকটন্দুক কিছু তো নেই দেখছি—ভয় করে না?

—না। আমি জবাব দিলাম।

— এখানকার বুনো জন্তুদের সঙ্গে তোমার অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে নাকি?

—ওরা বোধ হয় বোঝে যে আমি ওদের কোন ক্ষতি করব না, তাই কিছু বলে না আমাকে।

—কী করছ তুমি এখানে বললে না তো?

—তামাটামা ছাড়া আর কিছু আছে কি না খুঁজছি।

—তাই নাকি! ভদ্রলোকের চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল: কিন্তু এই "আর কিছু"র খবর কে দিল তোমাকে?

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হলেও সহজাত জ্ঞান ছিল তাঁর এই সব পাহাড়-বন সম্বন্ধে।

—এই "আর কিছু" আমিও খুঁজছি হে! মনে হয় খুঁজে পেয়েছি।

—খুঁজে পেয়েছেন! কী খুঁজে পেয়েছেন জানতে পারি কী?

—নিশ্চয়ই পার, তবে তার আগে আমার জানা দরকার তুমি কে। আমার পরিচয় হল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন জিওলজিস্ট, আমার নাম খেদকর। সম্প্রতি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এর অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন-এর

অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে এখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাচ্ছি—আমার তত্ত্বাবধানে এখানে, মানে সিংভূমের এই তামা অঞ্চলে আটজন জিওলজিস্ট কাজ করছে।

—মহারাষ্ট্রিয়ান হয়েও এমন চমৎকার বাংলা বলছেন আপনি! খেদকর-এর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম আমি।

—মহারাষ্ট্রিয়ান হলেও আমি বাঙালী। মৃদু হেসে বললেন খেদকর। কারণ আমার স্ত্রী বাঙালী—কলকাতা শহরে বসবাস করছি। আমার কথা অনেক হয়েছে, এবার তোমার কথা বল।

দিলাম আমি আমার পরিচয়। শুনে খুশি হয়ে খেদকর বললেন, তুমিও লেগে যাও না আমার কাজে। বিভূতিবাবুর "আর কিছু" খোঁজার কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যেতে পার।

আমি বললাম, এই "আর কিছু"র খোঁজ তো পেয়ে গেছেনই বলছিলেন। কী খুঁজে পেয়েছেন দেখাবেন আমাকে?

—নিশ্চয়ই। এখনই, এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি। চোখে অবশ্য দেখতে পাবে না…

—চোখে না দেখেও দেখতে পাব! আপনি কী হেঁয়ালি করছেন আমার সঙ্গে?

—না। চোখে তাকে দেখতে না পেলেও এই যন্ত্রটির মধ্যে তার উপস্থিতি ধরা পড়বে।

বলে তাঁর পথপ্রদর্শকের হাত থেকে বাক্স আকারের যন্ত্রটি নিয়ে খেদকর একটি শিলা-খণ্ডের ওপরে বসালেন। শিলাখণ্ডটি ফিলাইট-এর স্তরের একটি খণ্ডিত অংশ। তার মধ্যে চ্যালকোপাইরাইট ও পাইরাইট-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন টুকরো ছাড়া হলুদ ও সবুজ রঙের কয়েকটি ছোপ চোখে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে শিলাখণ্ডটি পরীক্ষা করে তার মধ্যে অন্য কোনও খনিজ দেখতে পেলাম না।

শিলাখণ্ডটির ওপরে যন্ত্রটি বসিয়ে তার সুইচ টিপে দিলেন খেদকর। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। যন্ত্রটির কাঁটা ঘুরে গিয়ে চরম মাত্রা নির্দেশক অঙ্ককে স্পর্শ করল।

হতবুদ্ধির মত যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, ব্যাপার কী স্যার! যন্ত্রের কাঁটাটা ওরকম ঘুরে গেল কেন? ওর ভেতর থেকে ওরকম কট্‌ কট্‌ করে আওয়াজই বা বেরোচ্ছে কেন?

—ঐ পাথর থেকে বেরিয়ে আসা তেজস্ক্রিয়তা যন্ত্রটাকে উত্তেজিত করে তুলছে যে! খেদকর জবাব দিলেন।

—তার মানে এই যন্ত্রটিই তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র, মানে গাইগার-মূলার কাউন্টার?

—হ্যাঁ। পাথরের মধ্যে সূক্ষাতিসূক্ষ তেজস্ক্রিয়তা থাকলেও তা এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই পাথরের মধ্যে যে তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-অ্যাকটিভিটি আছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। তেজস্ক্রিয়তা বেরিয়ে আসছে তেজস্ক্রিয় খনিজ অর্থাৎ য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়ামযুক্ত খনিজ থেকে।

—আপনি কী বলতে চান যে, এই পাথরের স্তরের মধ্যে য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়াম আছে?

—আমার যন্ত্রটিই বলতে চাইছে এ কথা—আমি নয়।

বলে গাইগার-মূলার কাউন্টার যন্ত্রটি শিলাখণ্ডের ওপর থেকে তুলে নিয়ে তার গায়ে সযত্নে হাত বোলাতে থাকেন খেদকর।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, কিন্তু ডান্ সাহেব তাঁর মেমোয়্যারে যে লিখে গেছেন, সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়ামের কোন অস্তিত্বই নেই। ই, এফ, ও মারে নামে একজন ভূতাত্ত্বিক তাঁর কাছে এক টুকরো য়ুরেনিয়ামযুক্ত টরবারনাইট নিয়ে আসাতে তাঁর মনে হয়েছিল বুঝি তা অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছে।

—ডান সাহেবের যাই মনে হোক না কেন, ঐ পাথর থেকে যে রেডিও-অ্যাকটিভিটি বেরিয়ে আসছে তার প্রমাণ তো স্বচক্ষেই পেলে! এই রেডিও-অ্যাকটিভিটিকে অনুসরণ করে আমরা সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার পেয়ে যাব। যে আটজন জিওলজিস্ট আমার সঙ্গে এ কাজে সহযোগিতা করছে, তারা এই তামার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে গাইগার-মূলার কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে য়ুরেনিয়ামের সন্ধান নিয়ে চলেছে।

খেদকর-এর কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি। এখানকার বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে বিভূতিভূষণ কী এই তেজস্ক্রিয়তাকেই অনুভব করে ছিলেন? পরমাণুসম্ভূত এই পরমাশক্তিই কী রোমাঞ্চিত করেছিল তাঁর দেহমনকে?

আমাকে হতবুদ্ধির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খেদকর বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন জিওলজিস্ট? রেডিও-অ্যাকটিভিটি তোমার শরীরকে অসাড় করে দিয়েছে নাকি?

—না, তা নয়। আমি বললাম, আমি ভাবছিলাম বিভূতিবাবু কী এই রেডিও-অ্যাকটিভিটির হদিস পেয়েছিলেন?

—তা হতে পারে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল খেদকর-এর মুখ: গাইগার-মূলার কাউন্টার-এর সাহায্য ছাড়া আমিও অনুভব করেছি এখানকার রেডিও-অ্যাকটিভিটি।

এ কথা অবশ্য কাউকে বলি নি আমি এ পর্যন্ত, কারণ কেউই বিশ্বাস করবে না আমার কথা।

তারপর আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে খেদকর বললেন, বিভূতিভূষণ যা অনুভব করেছিলেন, তাকে তোমার চোখের সামনে দেখে কেমন লাগছে মিস্টার জিওলজিস্ট ?

—অদ্ভুত লাগছে ! অভিভূত স্বরে বললাম আমি।

—তোমার কী ইচ্ছে করে না এটাকে ফলো আপ করতে ? মানে এই রেডিও-অ্যাকটিভিটিকে ফলো করে রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেলস-এর ডিপোজিটগুলো খুঁজে বের করতে ?

—নিশ্চয়ই করে। আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, তেজস্ক্রিয় খনিজের গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করব, এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কী হতে পারে।

আমার একটি হাত তাঁর দু হাত দিয়ে চেপে ধরে খেদকর বললেন, তা হলে লেগে যাও এই কাজে। আমি আমার 'স্টক' থেকে তোমাকে একটা গাইগার-মূলার কাউন্টার 'লোন' দেব, সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো…

পাহাড়ের নীচে মোসাবনীর রাস্তায় অপেক্ষা করছিল খেদকরের জীপ। সেই জীপে করে খেদকরের সঙ্গে তাঁর ক্যাম্পে এলাম। একটি আনকোরা নতুন গাইগার-মূলার কাউন্টার আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি বললেন, দেখ বাপু, এই যন্ত্রটি যত্রতত্র ঠেকিয়ে পরীক্ষা করতে কার্পণ্য করো না। রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল চিনতে হবে রেডিও-অ্যাকটিভিটি মেপে। যেখানেই রেডিও-অ্যাকটিভিটি, সেখানেই রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল—চোখে দেখতে না পেলেও। অনেকটা ভগবানের মত—আছেন, অথচ চোখে দেখে না কেউ।

গাইগার-মূলার কাউন্টার যন্ত্রটি নিয়ে শুরু করলাম তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান। ঘাটশিলার দক্ষিণে পাহাড়ে পাহাড়ে পাথরের স্তরের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করি। যে কোনও পাথরে যন্ত্রটা ঠেকিয়ে তাকে চালু করে দিই। চোখে দেখা যায় না, বা দেখেও চেনা যায় না সচরাচর, কাজেই তেজস্ক্রিয়তা দিয়েই চিনে নিতে হবে তেজস্ক্রিয় খনিজকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কী।

যে কোনও মৌল বস্তুর সূক্ষ্মতম অবস্থা হল পরমাণু। পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করলে বস্তুর বাঁধন যায় ঘুচে, মুক্তি পায় দুর্বার শক্তি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এই শক্তি প্রকাশ পায়। বস্তুর মধ্যে এমনিতে অবশ্য সংহত হয়ে আছে এই শক্তি—এই সংহতিই বস্তুর বাস্তব সত্তার ভারসাম্য বজায় রেখেছে।

বস্তু জড়ত্বের পাষাণ কারাগার, তার মর্মস্থলে আঘাত হেনে তার বাস্তব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। কিন্তু সব বস্তুই বাস্তব সত্তার অচলায়তনের মধ্যে বন্দী নয়। বাস্তব সত্তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তেজস্ক্রিয় ধাতুগুলির মধ্যে—তেজ বিকীর্ণ করে তাদের বস্তুসত্তা সততই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সব তেজ বিকীরণকারী ধাতুগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়াম, বিভিন্ন খনিজের রূপে পাথরের স্তরে স্তরে তাদের প্রচ্ছন্ন অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না। দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকলেও অবশ্য "রয় না গোপনে", তাদের মধ্যে থেকে বিকীর্ণ অদৃশ্য তেজ উত্তেজিত ও সোচ্চার করে তোলে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রকে। য়ুরেনিয়ামযুক্ত যে সব খনিজ শিলাস্তরে অবস্থান করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিচব্লেন্ড্ (pitchblende), য়ুরানিনাইট (uraninite), অটানাইট (autunite), টরবারনাইট (torbernite) প্রভৃতি। থোরিয়ামযুক্ত খনিজগুলোর মধ্যে মোনাজাইটই (monazite) প্রধান। মোনাজাইট-এর বিশেষত্ব হল তার রাসায়নিক ক্ষয় নিরোধের ক্ষমতা, যার দরুন পাথরের স্তর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তা মোনাজাইট-এর বালি সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বৃহত্তম 'মোনাজাইট বালি'র ভাণ্ডার রয়েছে কেরালার সমুদ্র তীরে। তামিলনাড়ু ও ওড়িশার সমুদ্র উপকূলও মোনাজাইট-এর বালির ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বহু পাহাড়ী নদী-নালার বালির মধ্যে মোনাজাইট আছে। তা চোখে পড়ার মত না হলেও তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের মধ্যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

তেজস্ক্রিয় খনিজগুলো সম্বন্ধে জানার পর যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে তা হচ্ছে, এই সব খনিজের খোঁজ কোথায় কোথায় করা উচিত? এ প্রশ্ন আমি খেদকরকে করাতে তিনি বললেন, সর্বত্র খুঁজবে—যে কোনও রকম পাথরের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় খনিজ পাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব পাথর দেখামাত্র তার ওপরে বসাবে তোমার যন্ত্র।

—যে কোনও পাথর, মানে কয়লার মধ্যেও কী তেজস্ক্রিয় ধাতু পাওয়া যেতে পারে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই। খেদকরের উত্তর: ভগবান যেমন সর্বভূতে বিরাজ করছেন, তেমনি য়ুরেনিয়াম-থোরিয়ামও সব রকম পাথরে থাকতে পারে। কাজেই কয়লার স্তরের মধ্যে য়ুরেনিয়াম-থোরিয়ামের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলা চলে না।

সর্বত্র যা আছে, তাকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন, কাজেই যেখানে সহজলভ্য বলে বোধ হয়, অনুসন্ধান সেখানেই প্রথমে চালাব ভাবলাম।

বিভূতিভূষণ ও খেদকরের অন্তর্দৃষ্টি যে অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জের আভাস পেয়েছে, প্রথম তার দিকেই নজর নিই। তাম্রক্ষেত্রজোড়া বনাকীর্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে তেজস্ক্রিয়তা মাপতে

মাপতে সুদূরপ্রসারী তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেলাম। কন্যালুকা, রাখা মাইন্‌স, তামা পাহাড়, যাদুগুড়া, ভাটিন, নারওয়া পাহাড়, তুরামডি ও কেরুয়াডুংরি পাহাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার আমার তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রকে উত্তেজিত করে আমাকে উত্তেজিত করে তোলে।

সিংভূমের তাম্রক্ষেত্রের তেজস্ক্রিয়তা আমার মত কজন ভূতাত্ত্বিককে উত্তেজিত করে তুলেছিল জানি না, তবে বিভূতিভূষণ ও খেদকরের স্বপ্ন ক্রমশ সফল হয়ে ওঠে। শুরু হয় পাহাড়ে পাহাড়ে পুঞ্জীভূত তেজঃপুঞ্জকে বিদীর্ণ করার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি। ড্রিলিং করে স্তরে স্তরে য়ুরেনিয়ামযুক্ত অটানাইট, টরবারনাইট এবং সবার নীচে য়ুরানিনাইট আবিষ্কৃত হয়।

য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের পরিমাপ করা হয় যাদুগুড়া ও নারওয়া পাহাড়ে। যাদুগুড়াতে খনি এবং খনির পাশাপাশি য়ুরেনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা গড়ে তোলা হয়। খননের আয়োজন হয় নারওয়া পাহাড়ে।

এমনি করে সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র ক্রমশ য়ুরেনিয়ামের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

॥ চার ॥

খেদকর মনে করতেন, সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র শুধু নয়, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা-দস্তা, কাদাপাথর, চুনাপাথর, অভ্র প্রভৃতি খনিজের ক্ষেত্রের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার—যে কোনও খনিজের সঙ্গে তিনি 'য়ুরেনিয়াম' নামটি জুড়ে দিতে বলতেন।

য়ুরেনিয়াম নামটি জুড়ে দিলেই তা য়ুরেনিয়াম-এর ভাণ্ডার হয়ে ওঠে না, রীতিমত অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন য়ুরেনিয়ামকে চিনে নেওয়ার দরকার। কিন্তু খেদকরের কল্পনা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারে না, কাজেই তাঁর কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খনিজের মধ্যে য়ুরেনিয়াম সন্ধানের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়নি।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সিংভূমের তামার ক্ষেত্রের মধ্যে য়ুরেনিয়ামের প্রচ্ছন্ন অবস্থানের বিষয়ে কল্পনা করতে গিয়েও খেদকর বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা ও পরিহাসের পাত্র হয়েছিলেন। তখন রীতিমত জোর-জবরদস্তি করে তাম্রক্ষেত্রের মধ্যে য়ুরেনিয়াম অনুসন্ধানের কাজ চালু করেছিলেন তিনি। যে আটজন ভূতাত্ত্বিক তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদেরও এক রকম জোর করেই তিনি এই কাজের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, সিংভূমের তাম্রক্ষেত্রে য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও খেদকরের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসেনি কেউ—কাজেই অন্যান্য খনিজের মধ্যে য়ুরেনিয়াম সন্ধানের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের সমর্থন না পেলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভূতাত্ত্বিকের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন খেদকর, যার দরুন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কল্পনা-অনুপ্রাণিত ক্রিয়া-কলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি।

যে কয়জন ভূতাত্ত্বিক ওপরওয়ালাদের বিরূপতাকে উপেক্ষা করে খেদকরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। খেদকরকে খুব উচ্চ স্তরের ভূবিজ্ঞানী মনে না করেও তাঁকে আমি বড়ো ভূবিজ্ঞানী মনে করতাম, তার কারণ তাঁর ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাকে পরিপুষ্ট করত প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা।

প্রকৃতিকে ভালবেসে অবৈজ্ঞানিক বিভূতিভূষণের মধ্যেও ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এসে গিয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবর্জিত অনেক প্রকৃতি-প্রেমিক তাঁদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বহু উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমি নিজে এ ধরনের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি, যারা আছে "মাটির কাছাকাছি", তাদের মধ্যেও দেখেছি। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা যেন প্রকৃতির রহস্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

খেদকরের প্রেরণায় আমি তখন ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার "পারমাণবিক খনিজ" (Atomic Minerals) বিভাগে শিক্ষানবিশের কাজ নিয়েছি এবং বিহারের অভ্রক্ষেত্রে অভ্রযুক্ত পেগমেটাইট-এর (pegmatite) মধ্যে পিচব্লেণ্ড, সামার্সকাইট (samarskite), কোলাম্বাইট (columbite), মোনাজাইট প্রভৃতি য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়ামযুক্ত খনিজের খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু একটার পর একটা পেগমেটাইট পাথরের শিরা (vein) পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি যে এই সব খনিজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর (feldspar) আবরণ দিয়ে এমনিভাবে পরিবৃত রয়েছে যে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের-মধ্যে কোন সাড়া জাগছে না, তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কাজেই প্রতিটি পেগমেটাইটেই তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের কাঁটা অনড় হয়ে থাকে। বাটিয়া, বানরচুয়া, কুড়ওয়া, বামদা, চাকাই প্রভৃতি অনেক জায়গায় ঘুরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম—কিন্তু কোথাও পেগমে-টাইট-এর মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার কোন আভাস পেলাম না।

নানা জায়গায় নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত কৌনঝি নামে একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে এসেও একই অভিজ্ঞতা হল আমার। প্রায় পঁচিশটি পেগমেটাইট-এর শিরা পরীক্ষা করলাম—কয়েকটি অভ্রখনির মধ্যে নেমেও যন্ত্র বসালাম—কিন্তু কোন ফল হল না।

শেষ পর্যন্ত যখন আমার হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছে, তখন একজোড়া বিহারী দম্পতি এল আমার কাছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে স্ত্রীটিই বেশী চটপটে। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, তোহার মেশিনোয়া লগাকর কুছ্ নাহি মিলল বাবু?

মিষ্টি গলার স্বর—কিন্তু প্রশ্নটি খোঁচা-মারা। তাই রুষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, না মেলেনি—কিন্তু তাতে তোমার কী?

মেয়েটির চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সে বললে, হামার মিল গইস। রামুয়া

গাঁইতা দেকে গড্ঢা বনাইস—গড্ঢাসে আচ্ছা আচ্ছা সব পাথ্থল নিকল গইস।

সকৌতুকে বললাম, কী পেলে দেখি।

স্বামীকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বললে, এ রামুয়া, উতার তোহার আঙ্গোছা।

স্বামীটি তার কাঁধে ঝোলানো গামছা দিয়ে বাঁধা পুঁটলিটি নামাল। গ্রন্থি উন্মোচন করতেই ঝিকমিকিয়ে উঠল কয়েকটি কালো-পাথরের পিণ্ড। অনুমান করলাম যে ওগুলো সামার্সকাইট এবং কোলাম্বাইট। আমার অনুমানকে যান্ত্রিকভাবে যাচাই করে নিলাম তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের সাহায্যে।

—কোথায় পেলে এগুলো? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

—অভ্রকোয়াকা খাদানমে। মেয়েটি জবাব দিল, যাঁহা তু তিন চার রোজসে মেশিনোয়া লগাকর ঢুঁড়ল······

—সে কী! সেখানে যে আমি এক ফোঁটাও রেডিও-অ্যাকটিভিটি পাইনি।

মেয়েটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠে বললে, রেডিও নহি তো কা। রামুয়া গাঁইতি দেকে কোঁঢ়কে নিকাল দিহিন। জগা হাম বতাইস—রামুয়া খালি গড্ঢা বনাইস।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিন্তু তোমরা চিনলে কী করে?

—এইসেই। মুখ টিপে হেসে মেয়েটি জবাব দিল।

– এদের মধ্যে কোন্‌টি কী বলতে পার?

—জরুর।

বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়ে পাথরগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে বললে, ইয়ে কোলাম্বাটিয়া, আর ওয়াহ্ সামারকাটিয়া।

আমার মুখে আর কথা জোগায় না।

এর পর ওদের দুজনের সাহায্য নিই আমার সমীক্ষার কাজে। ওদের সাহায্যে কয়েকটি পেগমেটাইট-এর শিরার মধ্যে সামার্সকাইট ও মোনাজাইট-এর সন্ধান পেয়ে যাই। খেদকর এবং আমার ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য কর্মকর্তারা জানলেন, এ আমারই আবিষ্কার —আমাদের বিভাগীয় কার্যবিবরণীতেও রইল লেখা এ কথা। কারণ ভূবিজ্ঞানে অজ্ঞান নিরক্ষর মাটির মানুষদের সাহায্যে দুর্লভ খনিজ খুঁজে বের করার মত বিস্ময়কর ব্যাপারটাকে স্বীকৃতি দেবার মত সৎসাহস আমাদের কারুরই ছিল না।

বিহারের অভ্রক্ষেত্রের মত অভিজ্ঞতা আমার হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরেও হয়েছিল।

প্রকৃতিকে ভালবেসে অবৈজ্ঞানিক বিভূতিভূষণের মধ্যেও ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এসে গিয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবর্জিত অনেক প্রকৃতি-প্রেমিক তাঁদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বহু উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমি নিজে এ ধরনের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি, যারা আছে "মাটির কাছাকাছি", তাদের মধ্যেও দেখেছি। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা যেন প্রকৃতির রহস্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

খেদকরের প্রেরণায় আমি তখন ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার "পারমাণবিক খনিজ" (Atomic Minerals) বিভাগে শিক্ষানবিশের কাজ নিয়েছি এবং বিহারের অভ্রক্ষেত্রে অভ্রযুক্ত পেগমেটাইট-এর (pegmatite) মধ্যে পিচব্লেণ্ড, সামার্সকাইট (samarskite), কোলাম্বাইট (columbite), মোনাজাইট প্রভৃতি য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়ামযুক্ত খনিজের খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু একটার পর একটা পেগমেটাইট পাথরের শিরা (vein) পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি যে এই সব খনিজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর (feldspar) আবরণ দিয়ে এমনিভাবে পরিবৃত রয়েছে যে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের-মধ্যে কোন সাড়া জাগছে না, তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কাজেই প্রতিটি পেগমেটাইটেই তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের কাঁটা অনড় হয়ে থাকে। বাটিয়া, বানরচুয়া, কুড়ওয়া, বামদা, চাকাই প্রভৃতি অনেক জায়গায় ঘুরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম—কিন্তু কোথাও পেগমেটাইট-এর মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার কোন আভাস পেলাম না।

নানা জায়গায় নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত কৌনঝি নামে একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে এসেও একই অভিজ্ঞতা হল আমার। প্রায় পঁচিশটি পেগমেটাইট-এর শিরা পরীক্ষা করলাম—কয়েকটি অভ্রখনির মধ্যে নেমেও যন্ত্র বসালাম—কিন্তু কোন ফল হল না।

শেষ পর্যন্ত যখন আমার হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছে, তখন একজোড়া বিহারী দম্পতি এল আমার কাছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে স্ত্রীটিই বেশী চটপটে। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, তোহার মেশিনোয়া লগাকর কুছ্ নাহি মিলল বাবু?

মিষ্টি গলার স্বর—কিন্তু প্রশ্নটি খোঁচা-মারা। তাই রুষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, না মেলেনি—কিন্তু তাতে তোমার কী?

মেয়েটির চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সে বললে, হামার মিল গইস। রামুয়া

গাঁইতা দেকে গড্ঢা বনাইস—গড্ঢাসে আচ্ছা আচ্ছা সব পাথ্থল নিকল গইস।

সকৌতুকে বললাম, কী পেলে দেখি।

স্বামীকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বললে, এ রামুয়া, উতার তোহার আঙ্গোছা।

স্বামীটি তার কাঁধে ঝোলানো গামছা দিয়ে বাঁধা পুঁটলিটি নামাল। গ্রন্থি উন্মোচন করতেই ঝিকমিকিয়ে উঠল কয়েকটি কালো-পাথরের পিণ্ড। অনুমান করলাম যে ওগুলো সামার্সকাইট এবং কোলাম্বাইট। আমার অনুমানকে যান্ত্রিকভাবে যাচাই করে নিলাম তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের সাহায্যে।

—কোথায় পেলে এগুলো? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

—অভ্রকোয়াকা খাদানমে। মেয়েটি জবাব দিল, যাঁহা তু তিন চার রোজসে মেশিনোয়া লগাকর ঢুঁড়ল……

—সে কী! সেখানে যে আমি এক ফোঁটাও রেডিও-অ্যাকটিভিটি পাইনি।

মেয়েটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠে বললে, রেডিও নহি তো কা। রামুয়া গাঁইতি দেকে কোঁড়কে নিকাল দিহিন। জগা হাম বতাইস—রামুয়া খালি গড্ঢা বনাইস।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিন্তু তোমরা চিনলে কী করে?

—এইসেই। মুখ টিপে হেসে মেয়েটি জবাব দিল।

- এদের মধ্যে কোন্‌টি কী বলতে পার?

—জরুর।

বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়ে পাথরগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে বললে, ইয়ে কোলাম্বাটিয়া, আর ওয়াহ্ সামারকাটিয়া।

আমার মুখে আর কথা জোগায় না।

এর পর ওদের দুজনের সাহায্য নিই আমার সমীক্ষার কাজে। ওদের সাহায্যে কয়েকটি পেগমেটাইট-এর শিরার মধ্যে সামার্সকাইট ও মোনাজাইট-এর সন্ধান পেয়ে যাই। খেদকর এবং আমার ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য কর্মকর্তারা জানলেন, এ আমারই আবিষ্কার—আমাদের বিভাগীয় কার্যবিবরণীতেও রইল লেখা এ কথা। কারণ ভূবিজ্ঞানে অজ্ঞান নিরক্ষর মাটির মানুষদের সাহায্যে দুর্লভ খনিজ খুঁজে বের করার মত বিস্ময়কর ব্যাপারটাকে স্বীকৃতি দেবার মত সৎসাহস আমাদের কারুরই ছিল না।

বিহারের অভ্রক্ষেত্রের মত অভিজ্ঞতা আমার হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরেও হয়েছিল।

খেদকর বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্য বহু খনিজ সম্পদের মত পরমাণু শক্তির উৎসও লুকোনো আছে হিমালয়ের গিরিমালার গুপ্ত ভাণ্ডারে।

"···ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর অন্তহীন যুগযুগান্তর···"

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের এই অনুভূতির সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল খেদকরের মন। তাঁর মত আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে নগাধিরাজ হিমালয় অপরিমেয় সম্পদের আধার। এই বিশ্বাসের প্রেরণায় আমি চলে যাই সিকিমে। সেখানে শৈলতটে তাঁবু খাটিয়ে থাকি এবং ঘুরে বেড়াই চড়াই-উৎরাই বেয়ে। আমার হাতে হাতুড়ি, কোমরের বেল্টে কম্পাস এবং আমার নেপালী পথপ্রদর্শকের কাঁধে তেজস্ক্রিয়তা-মাপনী যন্ত্র ও স্যাম্পল রাখার ঝুলি। দুরারোহ চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে দূরে শুভ্র হিমরেখাঙ্কিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাই। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শিখর থেকে প্রতিফলিত কাঞ্চনরাগ আমার চারপাশের বননীল পাহাড়গুলোকে রাঙিয়ে দিত—মনে হত পাহাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে পুলকিত হয়ে উঠে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রটা হাতে নিয়ে পাথরে পাথরে শুরু করতাম আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু পাহাড়ে যত রঙিন প্রতিশ্রুতি হীরে-চুনী-পান্নার মত ঝলসে উঠুক, তেজস্ক্রিয়তা-মাপনী যন্ত্রটি থাকত অসাড় হয়ে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও পারমাণবিক বিকীরণের আভাস পাওয়া যেত না। মনে হত কোথাও বুঝি তেজস্ক্রিয়তার ছিঁটেফোঁটাও নেই।

'নেই' বলে নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে মন সরে না, তাই মনে করি, তেজস্ক্রিয়তাকে চাপা দিয়ে রেখেছে অতেজস্ক্রিয় পাথরের আবরণ, যাতে এমন কোনও ফাটল বা ফাঁক নেই যার মধ্য দিয়ে তেজস্ক্রিয়তা গলে বেরিয়ে আসতে পারে।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিই। সেদিন শেষবারের মত কয়েকটি শিলাখণ্ড পরীক্ষা করার পর ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি, খাড়া উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছে যেন দু-পাশের পাইনের বন নিশ্চল সবুজ বন্যার মত নিঃশব্দ ঢলের আকারে নেমে যাচ্ছে। এমন সময় একজন ভুটানী লামা আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। আমার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, পর পর কদিন ধরে দেখছি ঐ মেশিন দিয়ে কী যেন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছ। কোন রকম গুপ্ত ধনের হদিস পেয়েছ নাকি ?

—না পাইনি। ম্লান হেসে আমি জবাব দিলাম, তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

—এই সব পাথরের মধ্যে কোন অমূল্য সম্পদ পাবার আশা রাখ তুমি ? লামা মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করলেন, এমন কী আছে পাথরের আড়ালে যার অদৃশ্য উপস্থিতি তোমার যন্ত্রে ধরা পড়ছে ?

পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, আমাদের অনুসন্ধান ও সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার যেন আমরা পুরোপুরি গোপন রাখি, কাজেই লামার প্রশ্নের জবাব আমি দিই না। কিন্তু লামা নাছোড়বান্দা, তিনি আমার চোখে চোখ রেখে চাপা গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমালয় পর্বত হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের সাম্রাজ্য, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এখানে কোথায় কী আছে জানার অধিকার আমার রয়েছে। কাজেই জবাব দাও আমার প্রশ্নের।

আমতা আমতা করে আমি বললাম, কোথায় কী আছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই জানাতাম আপনাকে। কিন্তু—

—তার মানে তোমার মেশিন দিয়েও তুমি বুঝতে পারছ না পাথরের মধ্যে কী আছে!

—না। মেশিন একেবারে অসাড় হয়ে আছে।

—কিসে তোমার মেশিনে সাড়া জাগে বল আমাকে। হুকুমের সুরে বললেন লামা।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, পাথরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় খনিজ থাকলে তার তেজস্ক্রিয়তা এই যন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। মেশিনে কোন সাড়া জাগছে না, কাজেই ধরে নিতে হয় যে—

—যন্ত্রের ওপরে অতটা নির্ভরশীল হয়ো না। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লামা বললেন, ভগবান বুদ্ধের শরণ নাও—তিনিই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

বলে তিনি আমার কাছে এসে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রটিকে স্পর্শ করলেন। তারপর মৃদু মন্দ হাসতে হাসতে বললেন, এইবার যন্ত্রটিকে চালু কর···

যন্ত্রের সুইচটা 'অন্' করে দিতেই ঘটে এক বিস্ময়কর ব্যাপার—যন্ত্রটির তেজস্ক্রিয়তা-সূচক কাঁটা এক লাফে যন্ত্রের ডায়াল-এর চরম অঙ্ককে স্পর্শ করে।

—এ কী! আমি চমকে উঠে বললাম, এ কী করে হল!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে লামা বললেন, এ কী করে হল বুঝতে পারছ না। এখানকার মাটি ও পাথরের যাবতীয় তেজ ভগবান বুদ্ধের কৃপায় শুষে নিয়েছি—এখন গুম্ফায় গিয়ে তাঁর চরণে তা সমর্পণ করব······

লামার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের পরদিনই খেদকর এলেন আমার ক্যাম্পে। সব কথা শুনে আমার মুখের ওপরে জলন্ত দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, তুমি একটা বোকা—ঐ লামাটি নিশ্চয়ই তার পোশাকের মধ্যে রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল লুকিয়ে রেখেছিল—এই অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করেছিল হয়তো।

– কিন্তু রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল দিয়ে ঐ লামা করবেন কী ! আমি অবাক হয়ে বললাম।

—কী করবে তার খোঁজ নাও স্থানীয় লোকদের সাহায্যে।

কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি যে লামাদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে খোঁজ নেবার মত দুঃসাহস স্থানীয় লোকেদের নেই।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একজন জর্মন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী এই রহস্যময় ব্যাপারটির ওপরে আলোকপাত করলেন।

সন্ন্যাসিনী তীর্থভ্রমণে এসেছেন এই দেশে। তিব্বত থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন সিকিমে—এখান থেকে যাবেন বৌদ্ধ গয়া। তিনি বললেন যে এখানকার একটি গুম্ফার বুদ্ধমূর্তির পাশে তেজস্ক্রিয় পাথরের স্তূপ সাজানো হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের পরমা শক্তিই নাকি পাথরকে তেজস্ক্রিয় করে তুলেছে—কাজেই বুদ্ধের সঙ্গে পাথরের পুঞ্জীভূত তেজঃপুঞ্জকে পূজো করা হয়।

জর্মন সন্ন্যাসিনীর কাছে এই খবরটা পেলেও ঐ গুম্ফার মধ্যে ঢুকে ব্যাপারটা নিজের চোখে যাচাই করতে পারি নি গুম্ফার বিধিনিষেধের দরুন। ঐ লামার দেখাও পাইনি, কাজেই জানা হয়নি তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে, যার সাহায্যে তিনি এখানে তেজস্ক্রিয় পাথর খুঁজে পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণ, খেদকর, হাজারিবাগ জেলার দেহাতী দম্পতি ও সিকিমের লামা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ভূবিজ্ঞানই যে যথেষ্ট নয় তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। বিজ্ঞান যত শক্তিশালী হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্যাপ্ত চৈতন্যজ্যোতি থেকে সম্ভূত মানুষের মন যে তার চেয়ে শক্তিশালী বার বার তার প্রমাণ পেয়েও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভিমানে তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে আমরা অপারগ।

॥ পাঁচ ॥

অনুরূপ বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি প্রাচীনকালের খনিবিদ্‌দের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। বংশানুক্রমে তাদের বংশধরগণ তা বহন করেছে। কালক্রমে খনির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হারালেও তাদের রক্তের সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে মিশে থেকেছে।

প্রাচীন খনিবিদ্‌দের তথাকথিত খনি-বিজ্ঞান বা ভূবিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল না, তবু তাঁরা ভূগর্ভের খনিজভাণ্ডারের রহস্যভেদ করেছিলেন।

মাটির তলার সম্পদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কয়েকজন রাজস্থানীর কথা শুনেছিলাম আমার এক ভূতাত্ত্বিক বন্ধুর কাছে।

রাজস্থানের অন্তর্গত খেতরি দিল্লি থেকে প্রায় একশ' দশ মাইল দূরে ইংরেজদের আমলে একটি ছোট করদ রাজ্য ছিল। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে নিয়মিত তামার উৎপাদন হয়েছে। খেতরি শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত নীচু কোয়ার্টজাইটের (পরিবর্তিত বেলে-পাথর) পাহাড়ের মধ্যে তামা-যুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইরাইটের ছোট ছোট সীমাবদ্ধ সঞ্চয় পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। একটানা পনের মাইল ধ'রে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলো প্রাচীন খনির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কয়েকটির ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখা গেছে যে, জটিল সুড়ঙ্গের জাল চ্যালকোপাইরাইটযুক্ত শিলাকে অনুসরণ করেছে নির্ভুলভাবে। পাহাড়ের গায়ে নানা জায়গায় এই সব খনিতে প্রবেশের মুখ এখনো অটুট অবস্থায় রয়েছে। খনিগুলো মাটির নীচে প্রায় পাঁচশ' ফুট পর্যন্ত গভীর ছিল। খনির প্রবেশমুখ ছাড়া সুড়ঙ্গগুলোতে তাজা বাতাসের প্রবেশের পথও পাহাড়ের গায়ে জায়গায় জায়গায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাখা হয়েছিল।

আঠার শ' একত্রিশ খৃষ্টাব্দে এই খনিগুলো দেখতে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রুক। তখন খনিগুলোর প্রায় অন্তিম দশা—তামাবহুল চ্যাল্‌কোপাইরাইটের সঞ্চয়গুলো ক্রমশ বিরল হ'য়ে আসছে। যারা খনিতে কাজ করত তারা অবশ্য বুঝতে পারেনি যে পুরুষানুক্রমিক জীবিকার ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হ'তে চলেছে তারা। তামার খনির বাইরে অন্য কোনও জীবন সুস্পষ্ট ছিল না তাদের কাছে। খনির ভিতরকার সুড়ঙ্গগুলির অন্ধকারের সঙ্গে

একাকার হ'য়ে গিয়েছিল তাদের অস্তিত্ব। ভূ-গর্ভের অবরুদ্ধ বাতাস থেকে তারা আহরণ করত তাদের নিঃশ্বাসের বায়ু।

ক্যাপ্টেন ব্রুক তাদের দেখেছেন সূর্যোদয় থেকে শুরু ক'রে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খনির আঁধারের মধ্যে কাজ করতে। ভোর হ'তে না হ'তেই খনির প্রবেশমুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত শ্রমিকরা প্রদীপ, হাতুড়ি, ছেনি ও ঝুড়ি নিয়ে। খনির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে তারা নতজানু হ'য়ে বসেছে। তাদের মাথায় প্রদীপ, ডান হাতে হাতুড়ি, বাঁ হাতে ছেনি ও কোলের ওপর ঝুড়ি। মাথায় রাখা দীপের আলোয় জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে উঠেছে চ্যালকোপাইরাইটের ধাতব সোনালী রঙ—ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে তারা বিশ্লিষ্ট করেছে সোনা-রঙের খনিজকে। খনির ভেতরকার প্রচণ্ড তাপ, বদ্ধ দূষিত বাতাস এবং অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক শ্রমে সঙ্কুচিত হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য। গড়-পড়তা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের বেশী আয়ু ছিল না তাদের।

কিন্তু তবু পুরুষানুক্রমিক পেশাকে ত্যাগ করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারত না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জবরদস্তি বেগার খাটা ক্রীতদাস হ'লেও কূলগত বৃত্তির প্রতি তাদের নিষ্ঠাকে অস্বীকার করা যায় না।

ক্যাপ্টেন ব্রুক যখন খেতরির খনিঅঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তার কুড়ি-ত্রিশ বছর বাদেই খনিগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

এখানে নতুন ক'রে সন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। গত কুড়ি বছরে কয়েকটি বড় বড় তামার খনি গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রাচীন খনিগুলোকে পুনরুদ্ধারের এই উদ্যোগপর্ব স্থানীয় লোকেদের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারছে না। যে খনি নিশ্বাসের বায়ুর মত তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ছিল, এই একশ' বছরের ব্যবধানে সেই খনির সঙ্গে তাদের জীবনধারার যোগসূত্র যেন হারিয়ে ফেলেছে তারা। একশ' বছর আগে খনির গুপ্ত রহস্যভাণ্ডার থেকে উৎকৃষ্ট তামার আকর আহরণ করত যারা, তাদের বংশধররা আজ সাপ্তাহিক মজুরির বিনিময়ে শ্রমদান করছে শুধু।

এর কারণ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ ভূবিজ্ঞানী বা খনি-বিজ্ঞানীদের নেই। স্থানীয় জনসাধারণের অজ্ঞতাকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নেন। কিন্তু তাঁরা যদি সহানুভূতি দিয়ে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেন, তা হলে তাদের ঔদাসীন্যের মূল কারণটি উদ্‌ঘাটিত হবে তাঁদের কাছে। এক শতাব্দী আগে খনিগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের পূর্বপুরুষরা খেতরির তামার ক্ষেত্র থেকে চিরবিচ্ছেদের পরোয়ানা পেয়েছিল। তারা বুঝেছিল, বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপ্ত একটা অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত হ'ল চিরতরে।

তাদের বংশধরদের কাছে এই খনিটা মৃত অতীত ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কাছে যা মরে গেছে, তাকে পুনরুজ্জীবনের আয়োজনে সায় দিতে পারছে না আজ তারা সর্বান্তঃকরণে।

অবশ্য এদের মধ্যে কিছু কিছু উৎসাহী লোকের মনে তাদের পূর্বপুরুষদের খনিগহ্বরের রহস্যলীন জীবনের নেশা দোলা দিয়ে যায়। তাদের কয়েকজনের কথা আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম।

বন্ধু বলেছিলেন, রেওয়ারীর কাছে কোনও একটি গাঁয়ে থাকত সুরযলাল তার বাবা-মার সঙ্গে। তার পূর্বপুরুষেরা খেতরির খনিতে কাজ করত। খনি বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর তারা এখানে এসে সামান্য কিছু জমির বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাসের কাজ শুরু করল। খনির জমাট বাঁধা অন্ধকারের বাইরে মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে নতুন জীবন শুরু হ'ল তাদের। ক্রমশ তাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হল তাঁদের প্রাক্তন জীবিকার স্মৃতি।

খেতরির তামার খনি সম্বন্ধে গল্প শুনত সুরযলাল। বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি টুকরো। গল্পগুলি শুনত সে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সঙ্গে—যেন রূপকথা উপকথার সমপর্যায়ভুক্ত কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী শুনছে, এমনি মনে হত তার।

কিন্তু একদিন লোকমুখে খেতরির তামার খনি অঞ্চলে সরকারী ক্রিয়াকলাপের কথা শুনে মনের মধ্যে অভূতপূর্ব একটা আলোড়ন অনুভব করল সে। যেন তার পূর্বপুরুষদের আত্মা তার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে খেতরির খনির আঁধারের অভিমুখে টেনে নিয়ে যেতে চাইল তাকে।

সুরযলাল তার বাবার কাছে গিয়ে বলল যে সে খেতরিতে গিয়ে সরকারী তামার সন্ধানের কাজে অংশ নেবে। সুরযলালের বাবা রংলাল তখন তাদের পুরোনো কুটিরটির পাশে নতুন একটি মাটির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল। এই ঘরটি সম্পূর্ণ হলেই সুরযলালের বিয়ে হওয়ার কথা। পাত্রী ঠিক করা আছে। গাঁয়ের মুখিয়ার একমাত্র মেয়ে। খুব চড়া দাম দিতে হচ্ছে মেয়েটির জন্য। টাকা অগ্রিম দেওয়া আছে। রংলাল বিষয়ী লোক। সে জানে যে এ টাকাটা উশুল হতে সময় লাগবে না। কারণ মুখিয়ার বিষয়-সম্পত্তি সব তার ঐ মেয়েটিই পাবে।

সুরযলালের সঙ্কল্পের কথা শুনে রংলাল প্রথমে খুব হাসল। দৈনন্দিন কাজকর্মে অপটু, চাষবাসে আনাড়ি সুরযলাল খেতরির খনিতে কাজ করার দুঃসাহসিক কল্পনা করে কী করে সে ভেবে পেল না। তার বোধ হল ছেলের বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুরয-লালকে সে বললে, দেখ্, তোর বয়স এমন কিছু নয়। আমি মরে গেলে পর পাগলামি

করার সময় অনেক পাবি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কোনও রকম খামখেয়াল বরদাস্ত করব না।

সূরযলাল চুপ করে থাকে মনের মধ্যে মৌন সঙ্কল্পের গুরুভার নিয়ে।

একদিন কাউকে কিছু না বলে গ্রাম ছেড়ে রেওয়ারীতে চলে এসে ট্রেনে চাপল সূরযলাল। রেওয়ারী থেকে সত্তর মাইল দূরে নিমকাথানা। এখানে ট্রেন থেকে নেমে প্রায় সতেরো মাইল হেঁটে খেতরি শহরে পৌছাল সে।

খেতরি শহর থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে কোয়ার্টজাইটের পাহাড়ের নীচে সরকারী ক্যাম্প। অদূরে সিঙ্গানা গ্রাম। ক্যাম্পে এল সূরযলাল চাকরিপ্রার্থী হয়ে। ক্যাম্পের অধিনায়ক বহাল করলেন তাকে সার্ভে-কুলির দলে। নিম্নতম দিনমজুরী শিরোধার্য করে নিল সে খুশি মনে। সে বললে যে কাজের জন্যই সে কাজ চায়, টাকার জন্য নয়।

সূরযলালের কাজের তৎপরতা সবাইকে অবাক করল। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও পুরোনো খনির অনেক দুর্গম সুড়ঙ্গের মধ্যে সঠিক সার্ভের লাইন টেনে জরিপের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় সে। খেতরিতে আগে কখনো আসেনি, কিন্তু পরিত্যক্ত প্রাচীন খনিগুলোর আঁধারঘেরা রহস্য তার কাছে ধরা দিল অনায়াসে। কিছুদিনের মধ্যে সার্ভে কুলির দলে সর্দারের পদে উন্নতি হল তার। পুরোনো খনির অজ্ঞাত দুর্গম সুড়ঙ্গপথে খনিবিদদের সঙ্কুচিত সমীক্ষার জড়তাকে দূর করত সে সাহস দিয়ে, ভরসা দিয়ে। বিস্মৃতপ্রায় পথের পুঁথির পাঠোদ্ধারে রীতিমত সাহায্য করেছে সে তাঁদের।

আমি বন্ধুকে বললাম, তোমাদের রিপোর্টে সূরযলালের কথা লেখা উচিত। মনে হচ্ছে কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত সহজাত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ও জন্মেছে।

বন্ধু বললেন, সাধারণ কুলি ও। ওকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবার কথা আমরা ভাবতে পারিনে। সেও অবশ্য তা চায় না। সে তার ভেতরকার প্রেরণায় কাজ করছে কোনও রকম ফলের জন্য প্রত্যাশা না রেখে।

আমি আর কিছু বললাম না।

বন্ধু বলে চললেন, সূরযলাল ছাড়া আর একজন আছে, এই তামার পাহাড়ের রহস্যভেদের নেশা যাকে সূরযলালের মতই সমাজছাড়া করেছে। "গাদি-লোহারদের" কথা শুনেছ তো। সেই যারা রাণা প্রতাপের সঙ্গে চিতোর ছেড়েছিল। চিতোর পুনরুদ্ধার করার ব্রতকে পুরুষানুক্রমে ধারণ করে যারা স্থায়ী বাসা বাঁধেনি কোথাও—যারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত যাযাবরদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। কয়েক বছর আগে তারা ব্রতভঙ্গ করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্যে। তাদেরই একটি দল খেতরির আশেপাশে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল। সোমনি এই দলের

সর্দারের মেয়ে। বয়স তার ষোল-সতের হবে। খেতরির তামার পাহাড়ে সে ঘুরে বেড়াত ছাগলের পাল নিয়ে। দলের সব ছাগল চরাবার দায়িত্ব ছিল তার। পাহাড়ের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে ভেতরকার প্রাচীন খনিসুড়ঙ্গের প্রচ্ছন্ন দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে সে। অবশেষে দেখা গেল, ছাগল চরাতে এসে পাহাড়ের দুর্গম সুড়ঙ্গগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আচ্ছন্নের মত। বাবই থেকে সিঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত এই পনর মাইল লম্বা পাহাড়ের যেখানে যেখানে পুরোন খনি রয়েছে, সর্বত্র তার দেখা পাওয়া যেত। সবাই তাকে বলত পাগলী।

একদিন আমাদের সার্ভে পার্টি পথ হারিয়েছিল পাহাড়ের উত্তরদিকের খনিসুড়ঙ্গের জটিল জালে। সুরযলালও বাইরে বেরোবার পথের হদিস পাচ্ছিল না। ঘাবড়ে গিয়েছিল সকলেই। অন্ধকারের একটা জমাটবাঁধা ভয়ঙ্কর রূপ তাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এমন সময় সোমনি এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। আঁধার ফুড়ে বেরিয়ে এল যেন। সে তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল যে বাইরে বেরোবার পথ দেখিয়ে দেবে সে তাদের। কিন্তু আলো যেন না জ্বালানো হয়। সঠিক ঠাহর অন্ধকারেই পাবে সে, আলোতে নয়। সার্ভেয়ার অবাক হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, আলোতে আপত্তি কিসের ? সোমনি বললে যে অন্ধকারের পথ আলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাইরে এসে সার্ভেয়ার সোমনিকে প্রশ্ন করলেন, যেখানে আমরা দল বেঁধে যেতেও ভয় পাই, সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াও তুমি কোন্ সাহসে ?

সোমনি গম্ভীর মুখে বলল, আসল জিনিসটাকে খুঁজছি যে—ভয় পেলে চলবে কেন ?

সার্ভেয়ার বললেন, আসল জিনিস ! সে আবার কী !

সোমনি কোন জবাব দেয়নি।

সোমনির সঙ্গে সেদিনকার সাক্ষাৎকারের পর থেকে সুরযলালের মনে ক্রমশ এই ধারণা জন্মাল যে আসল জিনিসটা বুঝি আমাদের আয়ত্তের অতীত হয়েই থাকবে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় সোমনির অনুসন্ধানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করে সে। তার মনে হ'ল, সোমনি যেন আসল জিনিসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

দিন কয়েক বাদে সুরযলাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। শোনা গেল সোমনির সঙ্গে পরিত্যক্ত খনির গহ্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। সার্ভেয়ার বললেন, পাগলীটা ওকেও পাগল করে দিয়েছে।

তারপর কিছুদিন বাদে ওদের আর খেতরিতে দেখা গেল না। এখানে আসল জিনিসের খোঁজ না পেয়ে ওরা নাকি প্রতাপগড়ের দিকে চলে গেছে।

বন্ধু সিগারেটে বড়ো রকম একটা টান দিয়ে বললেন, ওরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে

যাওয়ার পর থেকে আমি যেন আর কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আসল জিনিসটা সত্যিই বুঝি এখানে নেই।

হেসে উঠে আমি বললাম, তুমিও পাগল হলে নাকি!

বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন, তুমি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারছ না। আদিম খনিবিদ্‌দের মত সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ওরা দুজনে এই তামার পাহাড়ের রহস্যভেদ করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে যদিও তাকে স্বীকৃতি দিতে পারিনে, কুসংস্কারের মত আমার মনে এই বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছে যে ওরা ভুল করে নি—ভুল হয়তো আমরাই করছি।

॥ ছয় ॥

সোমনি ও সুরযলাল দুজনে মিলে খোঁজাখুঁজি ক'রেও আসল জিনিসের সন্ধান পেয়েছিল কিনা জানা নেই। সোমনি ও সুরযলালের মত মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন অজ্ঞাত সম্পদ সন্ধানের নেশা যাকে পেয়েছে, সাময়িক প্রাপ্তিকে ছাপিয়ে যায় তার আরও পাওয়ার আকাঙ্খা। তাদের জীবনের মূলমন্ত্র "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।"

এ হেন সন্ধানের নেশা জনৈক ভূতাত্ত্বিককে তার সাময়িক ফললাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। সে যা পেয়েছিল, তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তার আরও পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। এই ইচ্ছা তাকে আরও গভীরভাবে সমীক্ষা চালিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল। এই ভূতাত্ত্বিকটির নাম আর, কে, শর্মা। মধ্যপ্রদেশের মালাঞ্জখণ্ডের ছয় পাহাড়ের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে করতে তার মনে হল পাহাড়ের বাইরের পাথুরে আবরণটি খোলস মাত্র, এই খোলসটিকে বিদীর্ণ ক'রে ভেতরের খবর নিলে অপরিমেয় সম্পদের আভাস পাওয়া যাবে। তার এই কথায় কর্ণপাত করে না তার সহকর্মীরা, ওপরওয়ালা সুপারিন্টেণ্ডিং জিয়োলজিস্ট ঘোষ-সাহেবও তার এই ছয় পাহাড় নিয়ে মাতামাতিকে সুনজরে দেখেন না। তিনি একদিন শর্মার সহকর্মীদের বললেন, শর্মা এই ছয় পাহাড়ের গ্র্যানিট পাথরের মধ্যে কী মধুর খোঁজ পেয়েছে কে জানে! এখান থেকে সে নড়তেই চাইছে না।

বলা বাহুল্য, শর্মা মধু খুঁজছে না, খুঁজছে খনিজ। তার লক্ষ্য ধাতুযুক্ত খনিজ। ধাতু মানে লোহা ছাড়া যে কোনও ধাতু। সোনা, রুপা, সীসা, দস্তা বা তামা, যে কোনও ধাতুর সম্ভাবনা নাকি উহ্য আছে এই ছটি পাহাড়ের আড়ালে। কিন্তু পাহাড়গুলোর গায়ে তার বিশেষ কোন চিহ্ন নেই।

পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে গ্র্যানিট (granite) পাথর দিয়ে। গ্র্যানিট অবশ্য শুধু এই পাহাড়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েও বিরাজ করছে। একই গ্র্যানিট এই ছয়-পাহাড়কে গড়ে তুললেও পাহাড়গুলোর মধ্যে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল গ্র্যানিটের লালচে বাদামী রঙের স্তূপকে বিদীর্ণ করে ওঠা শাদা কোয়ার্টজএর (quartz) শিরা উপশিরা। কোন কোন ভূতাত্ত্বিক ভেবেছেন, কোয়ার্টজ-

এর এই সব শিরা উপশিরাই ধাতুর বাহন—অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ গলিত শিলার আধার ম্যাগমা (magma) থেকে বিশেষ কোন একটি ধাতুকে বহন করে নিয়ে এসেছে এই ছয় পাহাড়ের মধ্যে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে যেখানে তারা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও বিশেষ কোন ধাতুর চিহ্ন তারা খুঁজে পাননি। জায়গায় জায়গায় কিছু তামাযুক্ত ম্যালেকাইটের (malachite) সবুজ ছোপ, লোহাযুক্ত লিমোনাইটের বাদামী স্তর—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যালেকাইট-এর সবুজ ছোপ গাছপালার সবুজ আবরণের মতোই প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনের বহু জায়গায় বাদামী ও ধূসর রঙের শিলাপটে আঁকা ছবির মত বিরাজ করছে। পাথরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু তামা সর্বত্রই আছে, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তারা এই সব সবুজ ছবিতে রূপান্তরিত। কিন্তু তাদের দেখে পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন তামাযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

আর লিমোনাইটের বাদামী প্রলেপ ? মাটি ও পাথরে তা সর্বত্রই দেখা যায়। লাল মাটি ও ক্ষয়ে যাওয়া পাথরকে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত লোহা মরচের মত আচ্ছন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রায় সবরকম খনিজ ও শিলাতে লোহা থাকে—জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তা খনিজ ও শিলাস্তরের রাসায়নিক বুনন থেকে বিযুক্ত হয় এবং সৃষ্টি করে লিমোনাইট-এর আবরণ—অনেক জায়গায় তা জমে জমে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড়েও তা আছে, আছে সব কটি পাহাড়কেই আচ্ছন্ন করে। তা দেখে পাহাড়ের আড়ালে কোন্ ধাতু বা খনিজ আছে তা আন্দাজ করা কঠিন।

ম্যালেকাইট বা লিমোনাইটএর মধ্যে কোন স্পষ্ট হদিস না থাকলেও ছয়-পাহাড়ে কয়েকটি প্রাচীন খনির গহ্বর দেখা যায়। বালাঘাটের ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল ব্লকমফিলড ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তাদের আবিষ্কার করেন এবং চিনতে পারেন প্রাচীনখনির অবশেষ বলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরকে অনুরোধ করেন সেগুলো পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে। ডিরেক্টর ব্লকমফিলডের চিঠি পাওয়া মাত্র সেখানে পাঠালেন ডব্লিউ কিংকে। বালাঘাট থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে ঘন বন দিয়ে বেষ্টিত মালাঞ্জখণ্ড তখন শিকারীদের কাছেও দুর্গম ছিল। বনের মধ্যে অন্যান্য বন্য প্রাণীর সঙ্গে ছিল অসংখ্য বাঘ ও বাইসন। মালাঞ্জখণ্ডের ছয় পাহাড়ের পাহারাদার যেন তারা। তাদের প্রতিরোধ ভেদ করতে গিয়ে বহু বাঘ ও বাইসন হত্যা করলেন কিং-সাহেব। বাঘ-বাইসনের বেষ্টনী পেরিয়ে অনেক কষ্টে পৌছলেন তিনি ছয়-পাহাড়ে, কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না তার রহস্য। প্রাচীন খনি গহ্বরগুলো পরীক্ষা করলেন তন্ন

তন্ন করে, কিন্তু কোন খনিজ বা ধাতুর গুপ্ত ভাণ্ডারের অভিমুখে তারা প্রসারিত হয়েছে কিনা তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ডব্লিউ কিং-এর পর আরও অনেক ভূতাত্ত্বিক এই ছয় পাহাড়ের খনি-গহ্বরগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। ধস নেমে গহ্বরগুলোর সুড়ঙ্গ পথগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে, কাজেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকে ভেতরের খবর নেবার সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ভেতরে বেশিদূর যেতে না পারলেও তারা অবশ্য বুঝতে পারেন যে খনন চলেছিল কোয়ার্টজএর শিরা উপ-শিরাকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ গ্র্যানিট পাথরের মধ্যে উদভেদিত এই কোয়ার্টজএর শিরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধাতু বা খনিজের ভাণ্ডারকে লক্ষ্য করেই প্রাচীন খনিবিদদের কর্ম-তৎপরতা চলেছিল।

খনি-গহ্বরগুলোর মধ্যে প্রাচীন খনিবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়, অতএব নতুন করে খননের আয়োজন করা হল। এর জন্য সমবেত হলেন কয়েকজন ভূতাত্ত্বিক এবং খনিবিদ। তাদের যৌথ প্রয়াসে ছয় পাহাড়ে কোয়ার্টজ-এর শিরা বেয়ে খননের কাজ শুরু করা হয়। লিমোনাইট এবং বিরল কিছু ম্যালেকাইটের ছোপ নিয়ে কোয়ার্টজ-এর শিরা গ্র্যানিটের স্তূপ বিদীর্ণ করে ভূগর্ভের দিকে প্রসারিত হয়েছে। লিমোনাইট অবক্ষয়ের প্রতীক—জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় পাথরের স্তর থেকে বিযুক্ত লোহা ক্ষয় পাওয়া পাথরের গায়ে প্রলেপের মত বিরাজমান। পাহাড়ের ওপর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার গভীর পর্যন্ত এই অবক্ষয়ের যেন কোন শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই কোয়ার্টজএর শিরা বেয়ে অনির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত একটি ফাটল প্রসারিত হয়েছে, যার দরুন এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায় তা নিরূপণ করা তাদের সাধ্যের অতীত।

অতএব মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড় থেকে তারা বিদায় নিলেন এবং তাদের রিপোর্টে লিখলেন, খোঁজাখুঁজি বা খোঁড়াখুঁড়ি করে কোন লাভ নেই, অবক্ষয়ের শেষ কোথায় তা জানতে একমাত্র ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরাই পারবেন।

এরপর আসরে নামলেন ভূপদার্থবিজ্ঞানীরা (Geophysicist)। মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড়ের মাথায় যন্ত্রপাতি বসিয়ে ভূগর্ভের দিকে তারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। কোয়ার্টজের শিরা বেয়ে তা নীচে নামল এবং কোন এক বিশেষ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে উঠে এল ওপরে। এই প্রতিফলিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিশেষ একটি গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে ভূগর্ভের স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তোলে। গ্রাহক-যন্ত্রের কাঁটায় যা ফুটে ওঠে তা থেকে বোঝা যায় যে প্রতিফলনের স্তর (layer of reflection) পর্যন্ত কোয়ার্টজ-এর শিরা কোন নির্দিষ্ট ধাতু-রূপ প্রাপ্ত হয়নি, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গও পারেনি অবক্ষয়ের সীমা পেরোতে।

অতএব ভূপদার্থবিজ্ঞানীরাও ব্যর্থ হলেন পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের মতো। রিপোর্টে লেখা হল, মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড়ে প্রাচীন খনিবিদরা কিসের অন্বেষণে মেতেছিলেন তা জানা যায় না, হয়তো যাবেও না কখনো। বোধ হয় সোনার হরিণের মতই অসম্ভবের পেছনে মাথা কুটেছিল তাদের সব প্রয়াস।

এরপর ঐ ছয়-পাহাড়ে কোন ভূতাত্ত্বিকেরই পদার্পণ ঘটা উচিত ছিল না। সব বিশেষজ্ঞই যেখানে ব্যর্থ, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই সেদিকে পা বাড়ানো উচিত নয়।

কিন্তু উচিত অনুচিত বিবেচনা করে না এমন মানুষ বিরল নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। যে যাই বলুক, তারা পথ দেখে নিজেদের অন্তর্দৃষ্টির আলোয়। অপরের মতামত বা পূর্ববর্তীদের ক্রিয়াকলাপের কাছে বিনা শর্তে কখনোই আত্মসমর্পণ করে না তারা। অনুসন্ধানের নেশায় তারা পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক ফলাফলকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে চায়। এই সব বিরল সন্ধানের নেশায় মাতা বিজ্ঞানীদের অন্যতম আর, কে, শর্মা পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে মালাঞ্জখণ্ড পাহাড়কে নতুন করে পরীক্ষা করতে চাইল। তার ওপরওয়ালা ঘোষ সাহেব তার প্রস্তাব মঞ্জুর করতে পারেন না, তিনি তাকে বোঝান যে যেখানে বহু ভূবিজ্ঞানী ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নতুন করে কাজ করতে চাওয়াটাই পাগলামি। কিন্তু শর্মা নাছোড়বান্দা, ঘোষ সাহেবকে সে বললে যে মালাঞ্জখণ্ড পাহাড়ে তাকে কাজ করতে দেওয়া না হলে আর কোন কাজই করবে না সে— বাধ্য হবে পদত্যাগ করতে। অগত্যা ঘোষ সাহেব অনুমোদন করেন তার কর্মসূচী।

বালাঘাট থেকে যাত্রা করে শর্মা তার জীপে করে এল বাইহার। তারপর পেরিয়ে আসে ঘন বন। ডবলিউ কিং-এর সময়কার বাঘ ও বাইসনদের প্রাধান্য এখন নেই, তথাপি বনের ঘনত্ব প্রায় আগের মতোই আছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই বন অদৃশ্য হয়েছে মালাঞ্জখণ্ড পাহাড়ের চারপাশে। বনের সীমা পেরিয়ে বিরসা গ্রামে পৌঁছতেই চোখে পড়ে বনশূন্য পাহাড়—চারপাশের সমতলভূমির বুক ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'। বনের একটানা সবুজ উত্তরীয় এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ছয়-পাহাড়ের ঢেউ খেলানো লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়কে অপাবৃত করেছে। ছয়-পাহাড় আসলে একই পাহাড়ের ছটি চূড়া। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত একটানা ঐক্যবদ্ধ বিন্যাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে।

শর্মা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই ছয়-পাহাড়ের দিকে। তার নোট বইয়ে সে লেখে, ছয়-পাহাড় উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে প্রসারী একটি ঐক্যবদ্ধ ভূতাত্ত্বিক গঠনকে

পরিস্ফুট করে তুলেছে। লম্বায় পাঁচ এবং চওড়ায় আধ কিলোমিটার এই পাহাড় যেন পাহাড়-প্রমাণ খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারকে চাপা দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু চাপা দিয়ে রাখা এই খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারের কোন চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে কোথাও ফুটে ওঠেনি। শর্মা লিখল, চোখে পড়ার মত চিহ্ন বলতে আছে প্রাচীন এই সব খনি গহ্বর—তা ছাড়া আছে এই পাহাড় ও তার বিশেষ বিন্যাস···

—ধাতু বা খনিজের ভাণ্ডারের প্রমাণ এই গর্তগুলো! ঘোষ সাহেব অবাক হয়ে তাকান শর্মার মুখের দিকে: পাহাড়ের বিন্যাস খনিজ ভাণ্ডারের বিন্যাসকে ফুটিয়ে তুলছে বলতে চাও! কোন ভূতাত্ত্বিকই তোমার এই সব অলীক কল্পনাকে মেনে নেবে না শর্মাজী!

—অলীক কল্পনা কাকে বলছেন স্যার! এদেশে এমন কোন খনি নেই যেখানে প্রাচীন খনির চিহ্ন নেই! কোলারের সোনা, সিংভূম ও খেতরির তামা, জাওয়ার-এর সীসা ইত্যাদি বহু খনিই প্রাচীন খনিবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। আমার ধারণা এদেশের সব কটি সোনা ও তামার ভাণ্ডারকে প্রাচীন খননকারীরা চিনে নিয়েছিল।

—সে না হয় হল। মাথা চুলকে বললেন ঘোষ সাহেব: কিন্তু পাহাড়ের বিন্যাস দিয়ে খনিজ ভাণ্ডারকে চিনতে যাওয়াটা পাগলামি নয় কী?

—খনিজ ভাণ্ডারের সঙ্গে শিলাবিন্যাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। শর্মা বললে, শিলাবিন্যাস প্রতিফলিত হয় পাহাড় পর্বতের বিন্যাসের মধ্যে। অতএব, পাহাড়-পর্বতের বিন্যাসের মধ্যে প্রকৃতির অনেক গোপন কথাই উহ্য আছে···পাহাড় শুধু পাহাড় নয় স্যার···

এর পর আর কোন কথা বলেন না ঘোষ সাহেব, শর্মা বিনা বাধায় চালিয়ে যায় তার কাজ।

শর্মার হঠাৎ খেয়াল হল বুঝি ঐ পাহাড়ের মাথায় মাটির স্তরের মধ্যে কোন গোপন হদিস প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধাতু বা খনিজ ক্ষয়ে গিয়ে মাটির তলায় জলের সঙ্গে মিশে ওপরকার মাটির স্তরে এসে পৌঁছেছে। অতএব শুরু করে সে দশ পনেরো মিটার অন্তর অন্তর মাটির নমুনা সংগ্রহে।

ঐ মাটির নমুনাগুলো নাগপুরের ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর সমাবেশ পাওয়া গেলেও বিশেষ কোন ধাতুর সমাহরণ (concentration) দেখা যায় না। তবে অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তামার যৎকিঞ্চিৎ আধিক্য দেখা যায়। একই সঙ্গে আকাশপথে বিমানচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সমীক্ষাও (EM and aeromagnetic analysis by airborne survey) চালানো হয়।

এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষার ফলাফল দেখে শর্মা তার রিপোর্টে লিখল,

মাটির ওপরে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা না গেলেও ভূগর্ভে বিপুল ভাণ্ডারের আভাস পাচ্ছি। সম্ভবত তা তামারই ভাণ্ডার। আমার অনুমান, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় ভূগর্ভে বহুদূর পর্যন্ত তামাযুক্ত খনিজ থেকে তামা বিযুক্ত হয়েছে। তামা অপসৃত হওয়াতে অবশিষ্ট থেকেছে লোহা—সেই লোহা সৃষ্টি করেছে লিমোনাইট। আমাদের পূর্ববর্তীদের খনন-ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থেকেছে এই লিমোনাইট-এর মধ্যে। ড্রিলিং করে এই লিমোনাইট-এর সীমা পেরিয়ে আমরা তামার গুপ্ত ভাণ্ডারে পৌঁছতে পারি।

ড্রিলিং মানে যন্ত্রের সাহায্যে শিলাস্তর বিদীর্ণ করা। লিমোনাইট হল শিলাক্ষয়ের অবশেষ। শিলাক্ষয়ের সীমা পেরিয়ে মূল খনিজের স্তরে পৌঁছতে হলে কতখানি গভীর পর্যন্ত ড্রিলিং করতে হবে তা জানা নেই। অনির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত ড্রিলিং করার এই প্রস্তাব তাই মনঃপূত হয় না ঘোষ সাহেবের। কিন্তু শর্মা নাছোড়বান্দা, কাজেই শেষ পর্যন্ত তার প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে বাধ্য হন ঘোষ সাহেব।

শুরু হল ড্রিলিং। ছয়-পাহাড়ের গায়ে বসানো ড্রিলিং মেশিন বিদীর্ণ করে গ্র্যানিট-এর কঠিন আবরণ। ড্রিল রড (drill rod) এমনি কোনাকুনিভাবে গ্র্যানিট-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে যাতে তা কোয়ার্টজ-এর শিরাকে অবক্ষয়ের সীমার নীচে বিদীর্ণ করতে পারে।

গ্র্যানিট-এর কঠিন স্তরগুলি ভেদ করে নীচে নামতে থাকে ড্রিল রড—রুদ্ধশ্বাসে তার অগ্রগতিকে লক্ষ করে শর্মা। গ্র্যানিটের ষাট সত্তর মিটার বিদীর্ণ করে তা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। এরপর পাথরের বিন্যাস থেকে হিসেব করা প্রায় প্রত্যাশিত গভীরতার মধ্যে তা কোয়ার্টজ এর শিরাকে স্পর্শ করে।

কোয়ার্টজ-এর শিরাকে শুধু নয়, তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত তামাযুক্ত চ্যালকো-পাইরাইটকেও স্পর্শ করে ড্রিলিং রড। চ্যালকোপাইরাইট-এর (chalcopyrite) স্তরটাকে রীতিমত চওড়া বলে মনে হয় শর্মার। ড্রিলিং রড তাকে বিদীর্ণ করতে গিয়ে একটা বিপুল আকারের তামার ভাণ্ডারকে উদ্ঘাটিত করে।

এই জায়গাটি ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গায় ড্রিলিং মেশিনের রড গ্র্যানিট ভেদ করে চ্যালকোপাইরাইট-এ স্তরে উপনীত হয়। ব্যাপারটি রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বনের সীমা পেরিয়ে তার খবর পেঁাছে যায় লোকালয়ে, পেঁাছে যায় কলকাতা, নাগপুর, জয়পুর, লখনউ, হায়দ্রাবাদ ও শিলঙে।

এমনি করে মালাঞ্জখণ্ড-এর ছয়-পাহাড়ের অন্তরালে বিপুল তামার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়, সেখানে আয়োজন হয় খনি-পত্তনের। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তৈরি করা হয় খনির পরিকল্পনা। ধরা পড়ে প্রকৃতির লুকানো ভাণ্ডার মানুষের সন্ধানী চোখে।

॥ সাত ॥

মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ যারা খোঁজে, তারা ভূবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে তাদের সন্ধান অসম্পূর্ণ হয়। কারণ মাটির নীচে যেমন পাথর আছে, মাটির ওপরে তেমনি গাছপালা গজায়। গাছপালাগুলি মাটি ও পাথরের স্বাক্ষর বহন করে, কারণ পাথর থেকে বিশ্লিষ্ট ধাতু মাটিতে এসে মেশে এবং মাটির-মধ্য থেকে তাকে আহরণ করে গাছপালাগুলি বেড়ে ওঠে ও বিশেষ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব মাটির তলার সম্পদ সন্ধানী ভূবিজ্ঞানীরা মাটি ও পাথর পরীক্ষা করতে করতে গাছপালার দিকেও নজর দেন। অনেক সময় গাছপালা খনিজের সন্ধান দেয়। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে বন-সমীক্ষারও প্রয়োজন অনুভব করেন ভূবিজ্ঞানীরা।

ছোটনাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে গিয়ে পাথরের চেয়ে বেশি সেখানকার বন আমাদের মনকে টেনেছিল। বনে বনান্তরে ঘোরাঘুরি করতে করতে বিভিন্ন গাছপালার সমাবেশ দেখেছিলাম। শাল, মহুয়া, আসান, পিয়াশাল, কেঁদ, জাম, অর্জুন প্রভৃতি গাছের সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছিল। পাথুরে জমিতে লাল্‌চে লোহাযুক্ত মাটির উপরে এই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে চিহোড়, কুরচি, বনপান, আতগুী প্রভৃতি লতাঝোপও দেখি। বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে শূন্যস্থান আছে, তাকে পূর্ণ করা শুধু নয়, গাছকে বেষ্টন করে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তারা। এই সব গাছ ও লতার সহাবস্থানের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানলেও আমি তাকে গুরুত্ব দেই না। সৌন্দর্যের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থাকলেও তার পাশ কাটিয়ে যাই। কারণ আমার ও অনেকেরই ধারণা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করে।

কিন্তু প্রকৃতির মোহন রূপের মূলে বিরাজ করছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। গাছপালা ও লতাপাতার সমাবেশের বিচিত্র বিন্যাস মাটি ও পাথরের স্তরের রাসায়নিক উপকরণগুলির মিশ্রণের প্রতিবিম্ব; অর্থাৎ মাটি বা পাথরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপকরণ, বিশেষ ক'রে ধাতুর প্রাধান্য গাছপালার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকে সম্ভব করে তোলে।

গাছপালা ও লতাঝোপের এক বিচিত্র বিন্যাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমি সুকিন্দার

বনের মধ্যে। বনের বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে এক বিস্ময়কর তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলাম। তত্ত্বের সঙ্গে অমূল্য ঐশ্বর্যেরও সন্ধান পেয়েছিলাম।

আমার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি।

তখন জানুয়ারী মাস। শীত প্রখর হলেও আবহাওয়া সুন্দর। ভূ-বৈজ্ঞানিক পরিক্রমার পক্ষে এম্নি আবহাওয়াই অনুকূল। নাগপুর থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত এই অরণ্য অঞ্চলে এসে পৌছেছি। জায়গাটি জাজপুর-কেওঞ্জর রোড রেল স্টেশন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। দু-পাশে দুটি পরস্পর সমান্তরাল পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের নাম দইতারি ও মহাগিরি। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে জায়গাটি উপত্যকার মত বিন্যস্ত হয়ে আছে। কাছেই সুকিন্দাগড় শহর—প্রাক্তন 'সুকিন্দা' নামক করদ রাজ্যের রাজধানী। কাজেই, উপত্যকাটির নাম দেওয়া হয়েছে সুকিন্দা উপত্যকা। 'ক্রোমাইট' (Chromite) খনিজের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার দরুন উপত্যকাটি পৃথিবীসুদ্ধ ভূ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্রোমাইটের আকর্ষণে আমি ওখানে গিয়ে পৌছলেও আমার অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে ক্রোমাইটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাথর। এই পাথর হচ্ছে আপেক্ষিক ঘনত্বের হিসাবে ভারী জাতের আগ্নেয় শিলা। এই আগ্নেয় শিলার স্বরূপ নির্ণয় করে তার মধ্যে কি কি ধাতু আছে, তার সন্ধান নেওয়াই ছিল আমার কাজ।

সরুয়াবিল নামে শবরদের একটি গ্রামের কাছে ক্যাম্প করে আছি। আমাদের ক্যাম্পের কাছে একটি ক্রোমাইটের খনি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের (Laterite) আবরণ ভেদ করে এখানে ক্রোমাইট পাওয়া গেছে। ক্রোমাইটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আগ্নেয় শিলা ক্ষয় হয়ে এখানে ল্যাটেরাইটের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কাজেই আগ্নেয় শিলার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ নয় এখানে।

খনির বাইরে একটানা শুধু ল্যাটেরাইটের বিস্তার। ল্যাটেরাইটের নীচে কী আছে জানতে হলে খোঁড়াখুঁড়ি করা দরকার। খোঁড়াখুঁড়ি না করেও খোঁজাখুঁজি কি করে করা যায়, তা ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতে ঘোরাঘুরি করি বনের মধ্যে। ঘন বন, বনের মধ্যে অধিকাংশই শালগাছ। শালগাছগুলি আকারে খুব বড়। এমন বড় আকারের শালগাছ ছোটনাগপুরের বনেও দেখিনি।

বনকে দু-ভাগে ভাগ করছে দামাসাল নদী। নদীর দক্ষিণ দিকের বন উত্তর দিকের বনের তুলনায় অনেক বেশী ঘন। নদীর উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকের বন কেন বেশী ঘন, তা বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি যে, দক্ষিণে নানারকম লতাঝোপ আছে,

যা উত্তর দিকে নেই। লতাঝোপগুলি বড় আকারের গাছগুলির মাঝখানকার শূন্য স্থানকে পূর্ণ করে বনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘনত্বের জন্যে দক্ষিণের বনই আমার মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দক্ষিণের বন পরিক্রমা করি আমি।

বনের মধ্যে শালগাছ ছাড়া আছে আসান, পিয়াশাল ও কোংরা গাছ। বড় আকারের এই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে রকমারি লতা-ঝোপ। লতাগাছগুলিকেও চেনবার চেষ্টা করি। যে সব লতাগাছের প্রাধান্য চোখে পড়ে, তারা হচ্ছে কুরচি, খরসনা, বনপান ও আতগুী।

শালগাছের প্রাধান্যের দরুন এই বনকে শালবন বলা চলে। বহু দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শালবনকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। ল্যাটেরাইট ও ল্যাটেরাইটযুক্ত লাল্চে বাদামী রঙের মাটি:ক যেন তা একটানা আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

অবিচ্ছিন্ন এবং একটানা বিস্তৃত হলেও বনের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। দামাসাল নদীর দক্ষিণে কয়েকটি স্থানে শালবন থেকে হঠাৎ শালগাছগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আসানগাছগুলি হয়ে গেছে খর্বাকৃতি এবং শালগাছের স্থান নিয়েছে আতগুীলতা। এম্নি ঘনঝোপ সৃষ্টি করেছে যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন আতগুীলতারই বন। শালমুক্ত এবং খর্ব আসানযুক্ত এমনি পাঁচটি আতগুী লতাবন আবিষ্কার করলাম। শালবনের সমুদ্রের মধ্যে তারা যেন দ্বীপের মত জেগে আছে।

একটানা শালবনের মধ্যে এই পাঁচটি আতগুী লতাবন রীতিমত রহস্যজনক। এই ব্যতিক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজি। হাতের কাছে বইপত্র বিশেষ কিছু নেই, কাজেই আমার স্মৃতিশক্তির শরণাপন্ন হই। উদ্ভিদতত্ত্ব সংক্রান্ত পড়াশুনা আমার খুবই সামান্য, কাজেই স্মৃতি মন্থন করে বিশেষ লাভ হয় না। অগত্যা আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টা করি।

প্রথমে মনে হলো, এই পাঁচটি অঞ্চলে স্থানীয় আদিবাসীরা হয়তো শালবন পুড়িয়ে জুম চাষ করেছে। জুম চাষের হিসাব-নিকাশ সরকারী বন বিভাগের কাছে থাকে, কাজেই স্থকিন্দাগড়ে গিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করলাম।

নথিপত্র ঘেঁটে ফরেস্ট রেঞ্জার আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্থকিন্দা উপত্যকার মধ্যে এই শালমুক্ত আতগুী লতাবনগুলিতে শালগাছ নেই বলে আদিবাসীরা জুম চাষ করেছে। শাল বনেও মাঝে মাঝে করেছে তারা জুম চাষ, কিন্তু তার জন্যে শালগাছ কাটেনি তারা কখনো। স্থকিন্দার বনাঞ্চলের শালগাছগুলি বন বিভাগে কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে। তাদের কেটে ফেলবার অধিকার কারুরই নেই।

অতএব আতণ্ডী লতাবন পাঁচটির শালমুক্ত হওয়ার মূলে জুম চাষের যে কোন অবদান নেই, তা বুঝতে পারলাম। জুম চাষ বা শালগাছ নিধন নয়, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই বনের প াঁচটি অঞ্চল থেকে শালগাছগুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া? তা কি কোন রকম মড়ক? কিন্তু এমন কোন মড়ক কি সম্ভব, যা শুধু বেছে শালগাছগুলিকেই আক্রমণ করবে?

অনেক চিন্তা করেও এ ধরনের কোন মড়কের কথা ভেবে পেলাম না।

মড়কের বিকল্পে তেজস্ক্রিয়তার কথা মনে হলো। মাটির নীচে হয়তো এমন কোন তেজস্ক্রিয় (Radio-active)খনিজ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে, যা থেকে বিকীর্ণ তেজস্ক্রিয়তা শালগাছগুলিকে সংহার করেছে।

কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার এমন পক্ষপাতপূর্ণ সংহারলীলা কি সম্ভব? অর্থাৎ বেছে বেছে শুধু শালগাছগুলিকে বিনষ্ট করবে এ হেন তেজস্ক্রিয়তা কি কোথাও আছে?

তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান আমার সীমাবদ্ধ হলেও তার এহেন পক্ষপাতমূলক আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। অতএব বুঝলাম যে, এ রহস্যের মীমাংসা তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত রহস্যটি সমাধানের একটি সূত্র আমার মনে এল।

মাটি বা ল্যাটেরাইটের মধ্যে হয়তো এমন কোন রাসায়নিক উপাদান বা ধাতু রয়েছে, যা শাল ও আসানগাছের কাছে বিষাক্ত। তা শালগাছকে নিশ্চিহ্ন করে আসানগাছগুলিকে করে তুলেছে খর্বাকৃতি। তা আতণ্ডীলতার কোন ক্ষতিসাধন করে নি, কারণ আতণ্ডীলতার কাছে হয়তো ঐ বিষ অমৃতবৎ।

শাল ও আসানগাছের কাছে বিষ অথচ আতণ্ডীলতার কাছে অমৃতবৎ ধাতুটির স্বরূপ নির্ণয় করবার জন্যে শালমুক্ত অঞ্চলগুলি থেকে মাটি ও ল্যাটেরাইটের নমুনা সংগ্রহ করলাম। শালমুক্ত প্রতিটি অঞ্চল থেকে এক-শ' ফুট অন্তর অন্তর অনেকগুলি করে নমুনা খুঁড়ে বের করা হলো। তারপর তাদের অ্যালকাথিনের ব্যাগে পুরে নাগপুরে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠালাম।

এরপর চলে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। অবশেষে এল রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট। রিপোর্ট মানে মাটি ও ল্যাটেরাইটে প্রচ্ছন্ন ধাতুগুলির শতকরা পরিমাণের তালিকা।

তালিকাটি এক নজরে দেখেই চমকে উঠি। লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পাশাপাশি নিকেলের শতকরা পরিমাণ দেওয়া আছে। গড়পড়তা যতটা নিকেল থাকা উচিত,

তার চেয়ে অনেক বেশি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে এতখানি নিকেলের সমাহরণ (Concentration) মাটির নীচে নিকেলযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের নির্দেশ দিচ্ছে।

রিপোর্টটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নিকেলই যে শাল ও আসানগাছের কাছে বিষবৎ হয়ে উঠে শালগাছকে নিশ্চিহ্ন এবং আসান গাছকে খর্বাকৃতি করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না আমার। আতঙীলতার কাছে অবশ্য এই বিষ অমৃততুল্য হয়ে উঠেছে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

নিকেলের প্রভাবে শালগাছের বিনাশ এবং আতঙীলতার শ্রীবৃদ্ধি, অতএব শালমুক্ত এবং আতঙীলতাযুক্ত বনাঞ্চলে নিকেলের ভাণ্ডার প্রচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা।

এই সম্ভাবনার প্রেরণায় নিকেলের জন্যে সমীক্ষা শুরু করা হলো শালমুক্ত বনাঞ্চল পাঁচটিতে। সমীক্ষা মানে খোঁড়াখুঁড়ি, ড্রিলিং (Drilling) ও জরিপ। পাঁচটি অঞ্চলেই মাটির আবরণের আড়ালে নিকেলের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হলো।

শালমুক্ত বনের রহস্যভেদ করতে গিয়ে অতুলনীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান মিলল।

॥ আট ॥

বনের গাছপালার আকার, গড়ন, পাতাগুলির ঘনত্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ বা ধাতুর আভাস মেলে। সুকিন্দার বনক্ষেত্রে আতগুীলতার নিবিড় ঘন সমাবেশ মাটির নীচে নিকেল-কোবাল্টের ভাণ্ডার আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল আমাকে।

গাছের আকার, গড়ন এবং পাতায় সমাবেশ ছাড়া ফুলও মাটির তলায় ধাতুর সমাহরণের আভাস দেয়। ধাতুর সংস্পর্শে এসে ফুলের রং বদলায়।

ফুলের সাহায্যে খনিজের সন্ধান চমকপ্রদ হলেও সত্য। এ সম্পর্কে আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে।

সুকিন্দাতে নিকেল ও কোবাল্ট-এর নির্দেশক আতগুীলতার মত সীসা-দস্তা নির্দেশক বিশেষ এক ধরনের একটি লতার খবর পেয়েছিলাম আমি আমার এক ভূতাত্ত্বিক বন্ধুর রিপোর্টে। মাটির মধ্যে সীসা ও দস্তার সমাহরণ (Concentration) ঘটলে এই লতার ফুলের রঙ হয়ে ওঠে রক্ত-রঙিন। তিনি তাই তার নাম দিয়েছেন "রক্ত-ফুল"। এ হেন রক্ত-ফুলের সমাবেশ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশে সাতনার পশ্চিমে রাজগড় ও তার আশেপাশে এই রক্ত-ফুল দেখে তিনি মাটির তলায় সীসা ও দস্তার সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, ওখানকার মাটির আবরণ ভেদ করে পাথরের স্তরের মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করবেন। কিন্তু সে সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল তাঁর আকস্মিক মৃত্যু। তার রিপোর্ট প'ড়ে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমি নিয়েছি এবং চলে এসেছি মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমের এই পাহাড়ী এলাকায়। এখানে এসে খুঁজে বেড়াই সেই ফুল। কিন্তু আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধু কর্তৃক বর্ণিত সেই নামহীন ফুলের কোন চিহ্ন বনময় পাই না খুঁজে।

বন শেষ হয়, শুরু হয় ঢেউ খেলানো ফাঁকা মাঠ। প্রায় নিস্তৃণ প্রান্তরের ওপরে শুকনো লাল বেলে মাটির আবরণ টানা। জায়গায় জায়গায় লাল মাটি ও বালির আবরণ সরে গিয়ে ভেতরের পাথরের পাজা অনাবৃত হয়েছে। শক্ত পাথরের কঙ্কালের ওপরে শুকনো বালির শব-সাধনা চলছে যেন। এমনি নিষ্করুণ শুষ্কতার মধ্যে রসের স্থান নেই, রসে যার পুষ্টি তার নির্বাসন দণ্ড এখানে সোচ্চার। প্রকৃতির সবুজ সাজ এখানে বেখাপ্পা। কিন্তু তবু মেরু-বিজয়ের কেতন উড়িয়েছে ছোট ছোট ফণিমনসা ও কাঁটা গাছ এবং লতা-

ঝোপ। তাদের মধ্যে অবশ্য আমার সেই ঈপ্সিত রক্ত-ফুল নেই, যার মধ্যে মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন ধাতুর সত্তার প্রতিবিম্বিত।

—রক্ত-ফুল খুঁজছেন? আমার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন রাজগড়ের ফরেস্ট রেঞ্জার রাঘব মিত্র। রাজগড়ে পৌঁছেই তাঁর দপ্তরে গিয়ে ঐ ফুলের খোঁজ নিয়েছিলাম। আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধু রাজগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঐ ফুলের সমারোহ দেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ঐ ফুলযুক্ত লতাঝোপগুলিকে মানচিত্রবদ্ধ করে সীসা-দস্তার গুপ্ত ভাণ্ডারকে চিহ্নিত করেন। তাঁর সেই অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি আমার নকশা ও কম্পাস নিয়ে গিয়েছিলাম রাঘব মিত্রের কাছে।

—লাল, গোলাপী, হলদে, বেগনী, সাদা, নীল প্রভৃতি নানা রঙের ফুল আমার বাগানেই আছে। রাঘব মিত্র বলে চলেন, কিন্তু রক্তের ছোপ-ধরা ফুল কোথাও দেখিনি।

আমি বললাম, আমার জিয়োলজিস্ট বন্ধু পাঁচ বছর আগে রাজগড়ের আশেপাশে ঐ ধরনের অজস্র ফুলগাছ দেখেছিলেন। এক জায়গায় প্রায় আধ মাইল লম্বা লাইন ধরে ঐ ফুল ফুটে থাকতে দেখেছিলেন তিনি।

রাঘব বললেন, আপনার কথা শুনে বোধ হচ্ছে আপনার বন্ধু এক ধরনের বুনো লতাগাছ দেখেছিলেন। কিন্তু ওগুলো তো আগাছা ছাড়া আর কিছু নয়, কাঁটা ঝোপের সঙ্গে ওগুলোকে হয়তো উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে! আমি আঁৎকে উঠলাম!

—নিশ্চয়ই। গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণ করলেও আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট আগাছা সংরক্ষণ করে না—আমাদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কাঁটাঝোপ, আগাছা ইত্যাদি আমরা উপড়ে ফেলে দিই। হয়তো দেখেছেন রাজগড়ের চারপাশে প্রায় এক হাজার একর জমিতে সেগুন গাছের চাষ করা হচ্ছে—চাষ শুরু করার আগে জমি তৈরি করা হয়েছিল, সে সময় নিশ্চয়ই আগাছা-টাগাছাগুলো সব নির্মূল করে ফেলা হয়েছে···

সত্যিই তাই। বনবিভাগের সেগুন চাষের ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে এই সব বন্য লতার কোন স্থান নেই। প্রায় মরুভূমির রিক্ততার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে এখানকার বনবিভাগের কর্মতৎপরতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। প্রকৃতি যেখানে সবুজ সাজ খসিয়ে শুষ্ক তাপের আসন পেতেছে, সেখানে কী কৌশলে বনবিভাগ মরুবিজয়ের কেতন উড্ডীন করেছেন ভেবে পেলাম না। প্রকৃতির প্রবল প্রাণশক্তি না বনবিভাগের কর্মিদের কর্মকুশলতা, কিসের স্বাক্ষর বহন করছে সেগুন গাছের নবোদ্গত এই চারাগুলি?

প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই সম্মিলিত অবদান এই 'রিক্ততার বক্ষ ভেদ করে' উন্মোচিত সবুজের বৈজয়ন্তী। মানুষের যত্নকৃত প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করছে মাটির ওপরে গাঁইতি,

কোদাল ও শাবলের চিহ্ন। অনাবশ্যক লতা ও কাঁটাঝোপ এবং আগাছা সযত্নে সমূলে উৎপাটিত, যাতে আসল গাছ বাধাহীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

আসল গাছ, মানে সেগুন গাছের চারাগুলির ফাঁকে ফাঁকে তন্ন তন্ন করে সন্ধান নিই, কিন্তু সেগুন ছাড়া অন্য কোন গাছ বা লতার হদিশ পাই না। বনবিভাগের কর্মিদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে একটি তৃণখণ্ডও পারেনি অনধিকার প্রবেশ করতে।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসি বনবিভাগের বিশ্রামগৃহে। আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধুর রিপোর্টটা খুলে আর একবার পড়ে দেখি রাজগড়ের আশেপাশে কোন কোন জায়গায় ঐ রক্ত-ফুলের প্রাচুর্য দেখা গিয়েছিল।

পড়তে পড়তে বিশেষ একটি জায়গার বর্ণনা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। জায়গাটি বনবিভাগের এই বিশ্রামগৃহের কাছাকাছি অবস্থিত। সেখানে নাকি রাশি রাশি রক্ত-ফুল ফুটে থাকত।

জায়গাটি বনবিভাগের এই বিশ্রামগৃহের প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে। আমার কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয় করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাই। হাঁটতে হাঁটতে দূরত্ব মাপবার একটি যন্ত্র ছিল আমার কাছে। যন্ত্রটির নাম পেডোমিটার। পেডোমিটার কোমরে ঝুলিয়ে নিই। আমার প্রতি পদক্ষেপে পেডোমিটারের কাঁটা এগিয়ে যায়। পেডোমিটার অনুযায়ী আধ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতেই একটি বিস্ময়কর দৃশ্য চোখে পড়ল। সেগুন গাছের চারা-লাগানো বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে একটি অপরূপ ফুলের বাগান। বাগানে অজস্র গাছপালা ও ফুলফলের সমারোহ। দেশী-বিদেশী রকমারি ফুল নানা রঙের বর্ণালী সৃষ্টি করেছে। গোলাপ অপরাজিতা জবা বকুল পারুল চাঁপা গন্ধকেশর রক্তকরবী দোপাটি টগর গন্ধরাজ যুঁই রজনীগন্ধা প্রভৃতির পাশাপাশি আছে লিলি প্যানসিজ ডালিয়া জিনিয়া কসমস মেরিগোল্ড ও হলিহক। সব ফুলের মধ্যে গোলাপের প্রাধান্য। বাগানের নানা জায়গায়, আনাচে-কানাচে গোলাপ শুধু গোলাপ। বাগানের মাঝখানে সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন লনের মধ্যে কয়েকটি শিরীষ গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে, তেমনি সুন্দর তার গন্ধ। সবুজের সঙ্গে সুর মেলানো এমনি নানা রঙের সমারোহের মধ্যে মাটির বিস্ময়কর সরসতা প্রকাশ পাচ্ছে। মৃত্তিকার অন্তরালে কোন রহস্য এই নানা রঙের রহস্যকে প্রকাশ করেছে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে।'

ফুলে ফুলে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি বিচরণ করতে করতেও খোঁজে রক্ত-ফুলকে। নানা

রঙের সঙ্গে লাল রঙের অজস্র প্রাচুর্য চোখে পড়লেও রক্ত-ফুলের রক্ত-রঙের কোন চিহ্ন পাইনে খুঁজে।

এমন সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন রাঘব মিত্র। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এখানেও খুঁজছেন। আপনি কি মনে করেন ঐ সব বুনো জঙ্গাল উপড়ে না ফেলে আমি আমার বাগানটাকে তৈরি করেছি।

—এটা বুঝি আপনার বাগান। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললাম আমি, বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছি—কিছু মনে করবেন না।

—ঢুকে পড়েছেন, বেশ করেছেন। সামনেই আমার বাড়ি—আসুন এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন…

—সে পরে হবে, এখন আপনার বাগানটা একটু ঘুরে দেখি।

—তা দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার ঐ রক্ত-ফুলের দেখা পাবেন না।

রাজগড়ের রক্ত-ফুল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কাজেই ওখান থেকে ফিরে আসার আয়োজন করি।

যাত্রার আগে দেখা করতে যাই রাঘব মিত্রের সঙ্গে। আমার দু'হাত তাঁর দুটি হাতের মধ্যে চেপে ধরে তিনি বললেন, আপনার রক্ত-ফুল নির্মূল করে আমার বাগান তৈরি করেছি; তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত রায়সাহেব। আমাকে আপনি মাপ করুন…

অবাক হয়ে রাঘব মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, সুন্দর একটি বাগান তৈরি করার জন্য বুনো লতাগাছকে যদি নষ্ট করেই থাকেন, তার জন্য দুঃখিত হওয়ার তো কিছু নেই রাঘববাবু।

আমি নাগপুরে ফিরে আসার দু মাস বাদে রাঘব মিত্রের কাছ থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেলাম:

রক্ত-ফুল আবার ফুটেছে—চলে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম আমি রাজগড়ে। সেখানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলাম রাঘব মিত্রের বাগানে গিয়ে।

বাগান রিক্ত। গ্রীষ্মের দাহ মাটি থেকে সব রস শুষে নিয়েছে—রক্তাভ ভ্রূকুটি মেলে পড়ে আছে রোদে ফুটিফাটা জমি। ফুলগাছগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ফুল যে একদা ফুটেছিল এখানে তার চিহ্নমাত্রও নেই।

কিন্তু রিক্ততার বুক ফুঁড়ে দেখা দিয়েছে ছোট আকারের লতা। তার পাতার আকার ছোট, পাতাকে চাপা দিয়ে ফুটেছে রক্ত-রঙের ফুল। বিশেষ একটি পঙক্তি ধরে

লতাগাছগুলোকে কেউ যেন যত্ন করে বসিয়ে দিয়েছে। ফুলের রং বিস্ময়কর রকম লাল, যেন মাটির বুক ফুঁড়ে রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে। আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধুর বর্ণনার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। এই তাহলে রক্ত-ফুল। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

—এটা হচ্ছে গুল-মেহেন্দী লতা। কে যেন বলে উঠলেন। নারীকণ্ঠ। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতী।

—ল্যাটিন ভাষায় এর নাম 'Impatiene balsania'। যুবতীটির মুখে মৃদুমন্দ হাসি : ও'র কাছে শুনলাম যে, আপনি এই ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন···

এমন সময় যুবতীটির পাশে এসে দাঁড়ালেন রাঘব মিত্র, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ইনি আমার স্ত্রী গায়ত্রী, উজ্জয়িনী য়ুনিভার্সিটিতে বুনো লতা ও ফুল নিয়ে গবেষণা করছেন।

আমি বললাম, আপনার অমন সুন্দর সাজানো বাগান যে শুকিয়ে গেছে মিস্টার মিত্র।

গায়ত্রী বললেন, সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বলেই দেখা দিল এই গুল-মেহেন্দী লতা, তাতে ফুটে উঠল এই রক্ত-রঙিন ফুল।

—সাজানো বাগানের চেয়ে এই বুনো লতাঝোপই আপনাকে বেশি খুশি করেছে দেখছি।

—নিশ্চয়ই। বন্যরা যেমন বনে সুন্দর, এখানকার নির্জলা রুক্ষ পরিবেশে এই গুল-মেহেন্দী লতার ঝোপই স্বাভাবিক ব্যাপার।...

স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে বলেই তার মধ্যে সেখানকার মাটি ও মাটির তলার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে। আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধু লিখেছিলেন, রক্ত-ফুলের সারির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আকরিক সীসা-দস্তার ভাণ্ডারের আকর।

ঐ গুল-মেহেন্দী লতার তলায় খোঁড়াখুঁড়ি করলে হয়তো উদ্ঘাটিত হত গুপ্ত সীসা-দস্তার ভাণ্ডার, কিন্তু বনবিভাগের কাছ থেকে অনুমতি পাইনি বলে অনুদ্ঘাটিত রইল এই রহস্য।

গুল-মেহেন্দীর রক্ত-রঙের ফুলের সঙ্গে সীসা-দস্তার নিবিড় সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজগড়ে না পেলেও রাজস্থানের জাওয়ারে পেয়েছিলাম। সেখানে সীসা-দস্তার খনির ওপরে ফুটে উঠেছে গুল-মেহেন্দীর ফুলের রাশি—তার রক্ত-রঙের মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সীসা-দস্তার গুপ্ত অস্তিত্ব।

॥ নয় ॥

বনের রহস্যভেদ তথা মর্মভেদ ক'রে খনিজের সন্ধান সম্ভব। প্রকৃতিপাঠে যে সক্ষম, প্রকৃতি তাকে সম্পদবান করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে গাছপালা নেই সেখানে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা খনিজ সম্পদের হদিস কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে?

মাটি ও পাথর পরীক্ষা, তাদের নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক তরঙ্গ প্রেরণ, মাটির মধ্যে কৃত্রিম কম্পন সৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে মাটিতে চাপা প'ড়ে থাকা খনিজ-ভাণ্ডার খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন ভূবিজ্ঞানীরা। এই সব পদ্ধতির সাহায্যে অনুকূল সম্ভাবনার আভাস পেলে তাঁরা ড্রিলিং ক'রে, অর্থাৎ গভীর নলকূপ খনন করে খনিজ-যুক্ত শিলাস্তরকে বিদীর্ণ করেন এবং তার নমুনা আহরণ করেন। বনভূমি বা মরুভূমির যে কোনও অঞ্চলে এই সব পদ্ধতির সাহায্যেই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়। উত্তর আমেরিকার এ্যারিজোনা এবং রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে এমনি করে বিপুল ধাতু ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

গতানুগতিক ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে মরুভূমির রিক্ততার মধ্যে কোন রকম সমীক্ষা সম্ভব নয় বলেই ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভূবিজ্ঞানী হিসেবে আমার নিজেরও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু মরুভূমির বুকে পাড়ি দিয়ে দেখি, মরুভূমির নিস্তৃণ রিক্ততা পুরোপুরি রিক্ত নয়—"রিক্ততার বক্ষ ভেদি" মরুভূমির মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদ জায়গায় জায়গায় বিচিত্রভাবে নিজেকে উন্মোচন করেছে।

মরুপ্রান্তরে আমার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল আমার বন্ধু রতনলাল সোলাঙ্কির সঙ্গে মরুভূমির বুকে পাড়ি দিতে গিয়ে। রাজস্থানের থর মরুভূমি গোবি-সাহারার তুলনায় ছোট হলেও নগণ্য নয়। তার বিশেষত্ব হল তার খনিজ সম্পদ। তার নিস্তৃণ বালি বা নেড়া কোয়ার্টজাইট-এর পাহাড় কত রকম ধাতু, রত্ন ও উপরত্নের ভাণ্ডার চাপা দিয়ে রেখেছে তার লেখা-জোখা নেই। চাপা দেওয়া সম্পদের অনেকখানি মানুষের নাগালের মধ্যে এলেও তার অধিকাংশের খবর ভূবিজ্ঞানীরা পাননি। এমনি একটি গুপ্ত খনিজ ভাণ্ডারের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম আমি রতনলালের সঙ্গে উটের পিঠে চেপে।

রতনলাল আমার স্কুলের সহপাঠী। সে স্কুলের গণ্ডী পেরোতেই তার বাবা বিষেণলাল কলকাতা থেকে চ'লে এলেন যোধপুরে। যোধপুরে তাঁর পৈত্রিক পাথর-খোদাইয়ের কারবার আছে। পৈত্রিক এই পেশা ছাড়া একটি নেশা নিয়ে মেতেছিলেন বিষেণলাল। যোধপুরের কাছে তেওরির পশ্চিমে মরুভূমির মধ্যে প্রায় আড়াইশো বর্গ-কিলোমিটার এলাকা ইজারা নিয়ে তিনি গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই গুপ্তধনের হদিস ছিল একটি পুরোনো পুঁথির মধ্যে। পুঁথিটা পেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার আমলের সিন্দুকের মধ্যে। একটানা প্রায় বারো বছর ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন তিনি, কিন্তু খুঁজে পান নি কিছুই। এতে অবশ্য দমে যান নি তিনি এতটুকুও, কারণ তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে, ঐ ইজারা নেওয়া এলাকার মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকোনো আছে ঐ গুপ্তধন। কিন্তু মরুভূমির মধ্যে দিনের পর দিন খোঁজাখুঁজি করতে করতে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেল। তখন তিনি রতনলালকে বললেন এই অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে।

বিষেণলালের পোষা উট ভূমরাজের পিঠে চেপে খোঁজাখুঁজি শুরু করে রতনলাল। তেওরির পশ্চিমে থর মরুভূমির বালির একটানা বিস্তার ছাড়া আর কিছু নেই। বিষেণলালের ইজারা নেওয়া এলাকাটি প্রায় চষে ফেলে সে, কিন্তু বালির আবরণের আড়ালে কোথাও গুপ্তধনের কোন আভাসই পায় না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সে আমার শরণাপন্ন হয়। আমি তখন ভূ-তত্ত্ব নিয়ে এম-এসসি পড়ছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রতনলাল যখন আমাকে চিঠি লিখল তখন আমাদের পূজোর ছুটি চলছে, কাজেই ওর চিঠি পাওয়া মাত্র যোধপুরে চলে যেতে কোন অসুবিধে হয় নি আমার।

তেওরির চারপাশের মানচিত্র রতনলালের কাছে ছিল, আর আমার কাছে ছিল একটি কম্পাস। কম্পাস হল দিগ্‌দর্শক যন্ত্র—তার সাহায্যে দিক-নির্ণয় করা যায়। ঐ কম্পাস ও মানচিত্র নিয়ে রতনলাল ও আমি ভূমরাজের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়ি ও পাড়ি দিই বালির সমুদ্রের মধ্যে।

বালির সমুদ্রই বটে। যতদূর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। বালির মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে ভূমরাজ। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় চোরাবালি লুকোনো আছে, চোখে দেখে তা চেনার উপায় নেই। কিন্তু ভূমরাজের সহজাত ক্ষমতা আছে তাকে চিনে নেওয়ার। সে অনায়াসে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। রীতিমত ভারি তার শরীর, কিন্তু বালির ওপরে দিব্যি পা ফেলে চলতে পারে। তা ছাড়া ওকে নিয়ে আর একটা মস্ত সুবিধে আমাদের। সেটা হচ্ছে খাদ্য ও পানীয় বিনা ক্ষিধে ও তেষ্টা মেটাবার ক্ষমতা আছে ওর। তার পিঠে কুঁজ ও পাকস্থলীর মধ্যে জমা জল একটানা দু সপ্তাহ ধরে তাকে পুষ্টি জোগায় ও তার তেষ্টা মেটায়।

কিন্তু দিনের পর দিন বালির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কাঁটাঝোপ চোখে পড়ল, বালির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, যেন বালির স্তূপই জায়গায় জায়গায় কাঁটাঝোপের আকার নিয়েছে। কিন্তু বালির মধ্যে এই কাঁটাঝোপগুলোর মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

সেদিনও অন্য সব দিনের মতই নিস্পৃহভাবে বালি ও কাঁটাঝোপগুলোকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে বালি···যতদূর নজর পড়ে বালির দানাগুলো থেকে ঠিকরে-পড়া আলো যেন আগুনের শিখার মতো জ্বল জ্বল করছে।

বালির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, রোদ ঝলসানো বালির দিকে চেয়ে চোখ অন্ধ হ'য়ে যাবার ভয়ে তাকাই কাঁটাঝোপগুলোর দিকে। দেখবার মতো নয়, তবু দেখতে থাকি।

কাঁটাঝোপগুলোকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মানচিত্রের মধ্যে ওদের চিহ্নিত করে ফেলার ঝোঁক চাপল। রতনলালকে এ কথা বলতেই সে অবাক হ'য়ে তাকাল আমার মুখের দিকে। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

দুমরাজের পিঠ থেকে নেমে কম্পাসের সাহায্যে মানচিত্রের ওপরে আমরা কোথায় আছি তা ঠিক করে ফেলি। তারপর একে একে কাঁটাঝোপগুলিকে চিহ্নিত করতে থাকি।

দিন দুই ধ'রে এমনি জরিপ করার পর মরুভূমির বালির পটভূমিকায় কাঁটাঝোপগুলোর মোটামুটি একটা ছবি ফুটে ওঠে মানচিত্রের মধ্যে। রতনলালকে তা দেখাতে মৃদু হেসে সে বললে, চমৎকার হয়েছে—কিন্তু এর থেকে গুপ্তধনের হদিস কি পাবে কিছু?

—পেতেও পারি। আমি জবাব দিলাম, তবে তার জন্য আরও ভাল ক'রে দেখা দরকার।

—আরও ভাল ক'রে দেখা!

আমার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে তাকায় রতনলাল: এতদিন ধ'রে এত দেখা হল—এর পরে আরও ভাল ক'রে দেখার কী আছে কিছু?

—আছে বই কি। এ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছি, সব দিনের আলোয় দেখেছি। এখন রাতের আঁধারে দেখতে হবে।

—রাতের আঁধারে দেখবে কী হে! রতনলালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে : আঁধারে কিছু দেখা যায় নাকি?

—যায় বই কি। আমি জবাব দিলাম, এমন অনেক জিনিস আছে যা রাতের আঁধারেই ভাল ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও সত্য, চাক্ষুষ না দেখলে বুঝতে পারবে না।

পরদিন রাত্রে উটের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কৃষ্ণপক্ষের রাত। তেওরি পেরিয়ে আসতেই মরুভূমি। কিন্তু এই অন্ধকারে মরুভূমিকে মরুভূমি বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একটা অন্ধকারের সমুদ্র। ওপরের আকাশটাও যেন একই আঁধার দিয়ে গড়া। তবে আকাশের আঁধার একটানা নিরেট নয়—তার মধ্যে তারাগুলো লক্ষ লক্ষ চুমকির মতো বসানো।

অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো অবস্থা হলেও আমরা দিশেহারা হই না, কারণ আমরা জানি যে ডুমরাজ দিশেহারা হবে না। এই মরুভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি ওর মুখস্থ, গভীর অন্ধকারের মধ্যে পা দিয়ে বালি ছুঁয়েই বুঝতে পারে কোথায় এসেছে সে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, অন্ধকারে এলোপাথাড়ি ঘোরাঘুরির পরও সে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের যোধপুরে।

অন্ধকারের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর বিরক্ত হ'য়ে রতনলাল বললে, পাগলের মতো আর কত ঘুরবে এই অন্ধকারের মধ্যে!

—ঘোরাঘুরি যতক্ষণ না সফল হচ্ছে—মানে যতক্ষণ কিছু একটা চোখে পড়ছে আমাদের—

—তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে! আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে রতনলাল, এই অন্ধ-কারের মধ্যে কী কিছু চোখে পড়বে আমাদের! আমরা কী বাঘ-ভালুক-বেড়াল, যে অন্ধকারে দেখতে পাব?

—ধৈর্য হারিয়ো না, সঠিক জায়গায় গিয়ে যদি পৌঁছতে পার, তাহলে ঠিকই দেখতে পাবে...

সঠিক জায়গাটি কোথায় সে সম্বন্ধে আমার নিজেরও কোন ধারণা নেই, কাজেই জায়গাটি খুঁজে বের করার ব্যাপারটি ডুমরাজের হাতে ছেড়ে দিই। যথেচ্ছ যেখানে খুশি যায় সে, তাকে কোন বাধা দিই না।

অবাধে এদিক ওদিক যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত বিশেষ একটি দিকে যেতে থাকে সে। চলতে চলতে হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দেয়, ওদিকে ওর পক্ষে লোভনীয় কিছু আছে যেন।

উটের লোভ জিনিসটার সঙ্গে উটের পালকদেরও কোন পরিচয় নেই। পানীয় বা

বাসস্থান কোনকিছুর ওপরেই কোন আসক্তি নেই তার। কাজেই কিসের টানে এমনি ছুটে চলেছে তুমরাজ তা রতনলাল ও আমি কেউই পারি না বুঝতে।

প্রায় মিনিট পনেরো এমনি চলল তুমরাজ। তারপর হঠাৎ একটা আশ্চর্য দৃশ্য উদঘাটিত হল আমাদের চোখের সামনে। অন্ধকারের মধ্যে একরাশ আলো—মরুভূমির বালি খুঁড়ে তা বেরিয়ে আসছে। ঐ আলো লক্ষ্য করেই ছুটছে তুমরাজ।

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষ থেকে শুরু ক'রে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলেই যেতে চায়, কাজেই তুমরাজের ঐ আলো লক্ষ ক'রে ছুটে-চলা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক ঐ আলো মরুভূমির বালি খুঁড়ে কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে?

ঐ আলোর কাছে এসে দেখি, আলোর উৎস বালি নয়, কাঁটাঝোপ। এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বালিকে চাপা দিয়ে রেখেছে ঘন সন্নিবদ্ধ কাঁটাঝোপ।

আলোর আকর্ষণে তুমরাজ এখানে ছুটে এলেও তার লক্ষ্য কাঁটাঝোপগুলো। সে তার লম্বা ঘাড় নামিয়ে কচমচিয়ে খেতে থাকে কাঁটাসুদ্ধ গাছগুলোকে।

তুমরাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ে কাঁটাগাছগুলোকে পরীক্ষা করতে থাকি আমি। প্রতিটি কাঁটাগাছ থেকেই আলো বেরিয়ে আসছে। আলো অবশ্য কাঁটাগাছ বিকীরণ করছে না, কাঁটাগাছের গায়ে লেগে থাকা ছত্রাক ফুঁড়ে বিকীর্ণ হচ্ছে। বোধ হয় এই ছত্রাকের জন্যই এই কাঁটাগাছগুলোকে খেতে এসেছে তুমরাজ। পরে জেনেছিলাম, ছত্রাক উটেদের কাছে রীতিমত সুস্বাদু।

আলো বিকীরণকারী ছত্রাকের কথা বইয়ে পড়ে-ছিলাম – তাকে চোখে দেখলাম এই প্রথম। খুব স্নিগ্ধ চোখ জুড়ানো আলো। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি আমি ও রতনলাল।...

পরদিন সকালে আবার ঐ কাঁটাগাছগুলোর কাছে যাই। দিনের আলো ঐ ছত্রাক থেকে বিকীর্ণ আলোকে চাপা দিয়ে রেখেছে, তাই ছত্রাকটিকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে। ঘন সবুজ তার রঙ—কাঁটাগাছের ডালগুলির গায়ে পাতলা পর্দার মতো লেগে আছে।

ছত্রাকের কিছু নমুনা তুলে নিয়ে আসি। যোধপুরের ল্যাবোরেটারিতে তা পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে সীসার সন্ধান পাই।

সীসা খুবই মূল্যবান ধাতু। এখানে তা এসেছে মাটির তলা থেকে। মাটির তলায় পাথরের স্তরে হয়তো সীসার গুপ্ত ভাণ্ডার আছে। জলের ক্রিয়ায় ঐ সীসার খানিকটা ওপরে উঠে এসে এই স্বয়ংপ্রভ মানে আলোবিকীরণকারী ছত্রাক সৃষ্টি করেছে।

মরুভূমির অন্যান্য কাঁটাগাছের সঙ্গে এই কাঁটাবনকেও মানচিত্রের মধ্যে আগেই চিহ্নিত করেছি। এখানে লাল দাগ দিয়ে রতনলালকে বললাম, এখানেই আছে তোমাদের গুপ্তধন…

আমার আন্দাজ যে ভুল নয়, তার প্রমাণ দিনকয়েক বাদেই পাওয়া গেল। খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে ঐ কাঁটাবনের তলায় সীসাযুক্ত খনিজের একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পেল রতনলাল…

॥ দশ ॥

ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে জল সন্ধানের কথাও বলা যেতে পারে, কারণ মাটির নীচে মাটি বা শিলাস্তরে সঞ্চিত জল-ভাণ্ডারকে খনিজ বলা চলে। অন্যান্য খনিজের মত জলও প্রকৃতিজাত এবং নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠনযুক্ত। লোহাযুক্ত হেমাটাইট যেমন লোহা ও অক্সিজেনএর সমাহার, জলও তেমনি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর যৌগ। জলের মূল উৎস সমুদ্র হলেও মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টি মাটির মধ্য দিয়ে শিলাস্তরে প্রবেশ ক'রে যে জলভাণ্ডার সৃষ্টি করে, তা খনিজভাণ্ডারের মতই শিলাস্তরের গঠন ও বিন্যাসকে অনুসরণ করে। অন্যান্য খনিজের মত তার সন্ধানেও রীতিমত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রয়োজন হয়।

মানুষের চাহিদার নিরিখে অন্যান্য খনিজের চেয়েও জল শ্রেষ্ঠ। সোনা, তামা, রুপা, হীরা, নীলা প্রভৃতি বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারলেও, জল ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। কাজেই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কর্মসূচি তৈরি করতে গিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা জলের সন্ধানকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

১৯৫৩ সালে ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজে নেমেই আদেশ পেলাম, জল খুঁজে বের কর। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে যে কয়জন ভূবিজ্ঞানী ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা (Geological Survey of India) বিভাগে তাদের কর্মজীবন শুরু করল, সকলেই পেল এই নির্দেশ।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা বলা হয়। নদী-নালা-হ্রদ-পুকুরে এত জল, জলের বাহুল্য এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে, কিন্তু তবু এ দেশের অধিকাংশ মানুষ জলবঞ্চিত – কোলেরিজের অভিশপ্ত নাবিকের মতই তাদের ভাগ্যে "water water everywhere, not a drop to drink"। অর্থাৎ জল থাকলেও তা পঙ্কিল ও দূষিত, পানের অযোগ্য। জল ছাড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না, কাজেই অধিকাংশ মানুষ এই অপেয় জলই পান করে। যাকে বলে "পরিশোধিত জলের সরবরাহ (filter water supply)," শহরের স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ। অতএব পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে দেশময়।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মেটাবার অন্যতম উপায় হল ভূতলবিহারী জলের ভাণ্ডার

(ground water resource) খুঁজে বের করা। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার আওতায় তা পড়ে—কয়লা, চুনাপাথর, তামা, লোহা, অভ্র প্রভৃতি খনিজের মত ভূস্তরে নিহিত জলকে খনিজজ্ঞানে সন্ধান নেন ভূবিজ্ঞানীরা। ১৯৫৩ সালে আমরা দশজন ভূবিজ্ঞানী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শুরু করলাম এই জল সন্ধানপর্ব।

আমরা কাজ শুরু করলাম বিহারের খরাপীড়িত একটি অঞ্চলে। জায়গাটি হাজারিবাগ জেলার পূর্ব অংশ—ব্যাপকভাবে মরুগ্রাসের কবলিত। দিগন্তবিস্তৃত নিস্তৃর্ণ মাঠ ও পোড়ামাটির শুষ্কতাকে বিদীর্ণ করেছে নির্জলা নদীর বালির বিস্তার। পূব থেকে পশ্চিম নদীর গতিপথকে চিহ্নিত করছে একটানা সাদা বালি—জলের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। এ অঞ্চলের দু-তিনটি গ্রামের প্রায় তিন হাজার বাসিন্দার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঐ শুকনো নদীর বালির গর্তে লুকানো জলটুকুমাত্র সম্বল। বালি খুঁড়ে গর্ত করে অতি কষ্টে জল মেলে, ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আধ কলসী জল হয় বিনা সন্দেহ। গাঁয়ের মেয়েরা রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে তপ্ত বালিতে গর্ত খোঁড়ে এবং গর্তে চুঁইয়ে ওঠা ফোঁটা ফোঁটা জল অনেক কষ্টে আহরণ করে অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে।

জলকষ্ট যে কাকে বলে এখানে এসে মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। অনিঃশেষ জলের পিপাসা, অথচ প্রাণভরে জল খাবার উপায় নেই। আমার পরিচারক নদীর বালি থেকেই জল সংগ্রহ করে গ্রামের জবরদস্ত মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কাজটা খুবই কঠিন, কারণ এদিককার গাঁয়ের মেয়েরা ঠিক "অবলা" নয়, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগেও তাদের কুণ্ঠা নেই। তা ছাড়া আমার নেপালী পরিচারক বাহাদুরকে তারা "পরদেশী" বলে মনে করে, বালি খুঁড়ে তার জল আহরণকে তারা জল হরণ বলে মনে করে। সেদিন একটি মেয়ে এসে বলে গেল যে তাদের পাশাপাশি বালিতে গর্ত খুঁড়ে বাহাদুর তাদের গর্তের জল টেনে নিচ্ছে—কাজেই ঐ নদীর বালি থেকে ওকে জল নিতে তারা দেবে না। তারপর ঐ মেয়েদের ব্যূহ ভেদ করে জলের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না বাহাদুর, বাধ্য হয়ে সে গ্রামের সীমা পেরিয়ে নদী যেখানে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করতে শুরু করে।

হাজারিবাগের এই খরাক্লিষ্ট এলাকায় শুধু নয়, দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে জল খুঁজতে গিয়ে এমনি জলকষ্টে ক্লিষ্ট হয়েছি। রাজস্থানের 'থর' মরুভূমির মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো "লোনা জল"-এর "নিপট" (হ্রদ), সেই "নিপট" থেকে স্থানীয় মরুচারীদের মত জল নিয়ে তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করেছি। মরুভূমির অধিবাসীরা এক ধরনের

ক্ষার মিশিয়ে লোনা জলের লবণত্ব দূর করে, সেই ক্ষার-এর খোঁজ পাই নি—কাজেই বাধ্য হয়েছি ঐ লোনা জল পান করতে।

জলরিক্ত অঞ্চলে জলকষ্টের ক্লেশই অবশ্য আমাদের প্রেরণা দেয় 'ভূ-জল', অর্থাৎ মাটির নীচে শিলাস্তরে প্রচ্ছন্ন জল খুঁজে বের করার কাজে। মাটির তলায় জলের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে শিলাস্তরের প্রকৃতি ও বিন্যাস। আগ্নেয় (igneous) ও পরিবর্তিত (metamorphic) শিলার মধ্যে জল ঢুকতে পারে না—পাললিক (sedimentary) কাদাপাথর (shale) ও চুনাপাথরেও (limestone) জলের প্রবেশাধিকার নেই। ফাটল (fracture) বা চ্যুতি (fault) তাদের বিশ্লিষ্ট করলে পর তাদের মধ্যে সাময়িক জলের আধার সৃষ্টি হলেও নির্ভরযোগ্য জলসম্পদের জন্য খুঁজে বের করতে হবে বেলেপাথর (sandstone) অথবা বালির (sand) স্তর, যার মধ্যে জলের গতি অবাধ এবং যা জলসম্পৃক্ত হয়ে জলের ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে পারে। বৃষ্টির জল মাটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে বালি বা বেলেপাথরের স্তরে, সেখানে সংরক্ষিত হয়ে সৃষ্টি করে স্থায়ী জলের আধার। অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টির দরুন মাটির ওপর যতই জলের অভাব ঘটুক না কেন, মাটির নীচের এই জলভাণ্ডার থাকে অক্ষয় হয়ে। আমাদের ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এই গুপ্ত জলের ভাণ্ডারের অস্তিত্বকে সারা দেশ জুড়ে উদ্‌ঘাটিত করে, পরীক্ষামূলক কূপ (test borehole) খনন করে এই জলের নাগালও পাই আমরা। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলে এই জল এত গভীরে অবস্থিত যে সরকারী আনুকূল্য ছাড়া ঐ জলের স্তর পর্যন্ত নলকূপ বসানো সম্ভব নয়।

সরকারী আনুকূল্য এবং অর্থানুকুল্যের অবশ্য অভাব ঘটেনি। আমাদের ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার পাশাপাশি এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে খরাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে অনেকগুলো নলকূপ খনন করে এই ভূতলবিহারী জল বা ভূ-জল (ground water) আহরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বিশাল দেশ এবং ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদার অনুপাতে তা খুবই নগণ্য। যা ছিল ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের বহুমুখী কর্মসূচীর অন্যতম, তা এখন কেন্দ্রীয় ভূ-জল সংস্থার (Central Ground Water Commission) ভারতব্যাপী বৃহৎ কর্মপর্বে ব্যাপ্ত—ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা বিভাগের মুষ্টিমেয় ভূবিজ্ঞানীর বদলে কেন্দ্রীয় ভূ-জল সংস্থার কয়েকশো জলবিজ্ঞানী ভূ-জল আহরণপর্বে লিপ্ত আছেন। কিন্তু তবু মেটেনি জলের অভাব, এদেশের অধিকাংশ মানুষের জলভাণ্ড আজও রিক্ত।

প্রায় তিন দশকের প্রয়াস সত্ত্বেও জলকষ্টের লাঘব যে হয়নি তার প্রমাণ, অধিকাংশ গ্রাম জলের জন্য আজও বৃষ্টিনির্ভর, ভূ-জল আহরণের প্রয়াস বহু জায়গাতেই হয়নি। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, আজও নদী-নালা বা জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করার কাজে

অন্ততপক্ষে দশ কোটি ভারতীয় নর-নারী সারাদিন ধরে নিযুক্ত। যে জল তারা আহরণ করে, তাও এমনি দূষিত যে তা পান করে দৈনিক অন্ততপক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষ রুগ্ণ হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলের শতকরা পঁচাত্তরজন খায় এই পানের অযোগ্য জল।

মানুষ শুধু নয়, বনের পশুরাও পীড়িত হচ্ছে জলকষ্টে। জলের অভাবের দরুন বন্যরা ছাড়ছে বন, বন ছেড়ে জলের সন্ধানে লোকালয়ের কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে। ফলে মানুষের কাছাকাছি হতে বাধ্য হচ্ছে এবং পৃথিবীর "হিংস্রতম প্রাণী" মানুষের হিংস্রতার কাছে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের একটি গভীর বনে এমনি জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল যে সেখানকার সব পশুপাখি বেরিয়ে এসেছিল বনের আশ্রয় ছেড়ে। এক বন থেকে বেরিয়ে বনান্তরে যায়নি, কারণ নিকটবর্তী অন্যান্য বনও অনুরূপ নির্জলা শুষ্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অন্য বনের বদলে তারা খুঁজেছিল জলের উৎস এবং শেষ পর্যন্ত জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত বহুরিবাঁধ গ্রামের নিকটবর্তী একটি জলের বাঁধের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আত্মসংরক্ষণের জন্য বিকল্প বন না পেলেও জল পেয়ে খুশি রইল তারা।

অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে একটি বাঘও বেরিয়ে এসেছিল বনের আশ্রয় ছেড়ে। সেও এসেছিল বহুরিবাঁধে এবং বহুরিবাঁধের বাঁধের সঙ্গে যুক্ত একটি নালার ধারে লতাঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

বহুরিবাঁধের বাঁধ থেকে পানীয় জল পেলেও খাদ্যের চাহিদা মেটে না। খাদ্যাভাবে বিশেষভাবে জর্জরিত হয় বাঘটি, কারণ যে সব বন্য তৃণভোজীকে শিকার করে সে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করত, তাদের একটিরও দেখা পায় না এখানে। অগত্যা ক্ষুধার তাড়নায় সে লোকালয়ে এসে গৃহপালিত পশুদের ওপরে হামলা করতে থাকে—একে একে হত্যা করে কয়েকটি গরু ও ছাগল। মানুষের গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দিকেও নজর দেয় সে, কয়েকজন মানুষকে হত্যা করে সে মানুষখেকো আখ্যা পায়। বাঘ সংরক্ষণ-যোগ্য হলেও মানুষখেকো বাঘের বেঁচে থাকার অধিকার নেই, কাজেই বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয় বাঘটিকে।

বনের পশুদের মত জলের অভাবে মানুষও তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের প্রায় ষাট লক্ষ গ্রামবাসী ১৯৮০ সালে জলের অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে জড়ো হয়েছিল। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে বোম্বাই শহরের কাছে মুরবাদ গ্রামে বালতি প্রতি একটাকা করে পানীয় জল বিক্রী হয়েছিল। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানকার স্ত্রীলোকরা দৈনিক অন্তত পক্ষে তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাবমত ভারত ও অন্যান্য বিকাশশীল দেশগুলির অন্ন ও অন্য-সমস্যার মত পানীয় জলের সমস্যাও তুঙ্গে আরূঢ়—যে জলকষ্টে এই সব দেশ ভুগছে, তা অভূতপূর্ব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে যে দশক শুরু হয়েছে তাকে আন্ত-র্জাতিক জল-দশক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ভারতের জলকষ্ট নিবারণের জন্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো বছরের সরকারী কর্মতৎপরতা এবং ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সত্ত্বেও জলসমস্যার কোন উল্লেখযোগ্য সমাধান ঘটেনি কেন। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে, এদেশে আর যা কিছুর অভাব থাক, ভূ-জলের অভাব নেই—কিন্তু তবু ত্রিশ বছর আগে জলের যে অভাব ছিল, সেই অভাবকে কেন আমরা উল্লেখ-যোগ্যভাবে মেটাতে পারি নি এ প্রশ্ন আমাদের সকলের মনকেই নাড়া দেয়।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। একটু তলিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে ভারত সরকার এবং জলবিজ্ঞানীদের (Hydrologist) তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট থেকেছেন—জলকষ্ট নিবারণে তাঁরা সক্রিয়ভাবে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। দেশের মানুষদের জলসমস্যাকে সব সমস্যার মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সমাধানের জন্য দেশের মানুষদের তৎপর হতে ডাক দিয়েছিলেন তিনি আজ থেকে নব্বই বছর আগে। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের মানুষদের তাদের দুর্দশার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে হলে জলসমস্যার সমাধান করতে হবে। শিলাইদহ ও সাজাদপুরে থেকে জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনা করতে গিয়ে মাটির একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন তিনি। পদ্মাতীরের সুজলা পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে জলকষ্ট তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি।

"...এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন—যে করে আরোগ্যবিধান, সে আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে।...বন্যা বারে বারে মারছে আমাদের দেশকে, হয় মরি জলের বাহুল্যে, নয়তো অভাবে। প্রধান কারণ এই যে পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে—বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করার শক্তি তাদের নেই।"

অতএব দেশসুদ্ধ সকলের কাছে আবেদন জানালেন তিনি জলকষ্ট নিবারণে সক্রিয় হবার জন্য। তিনি লিখলেন: "ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ, যাতে জীবজন্তুর

আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়।" এই সাধনায় ব্রতী হতে ডাক দিলেন তিনি সকলকে।

কিন্তু তাঁর এই ডাক শুনে প্রথমে কেউ এলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন যে সাময়িকভাবে "কলম কানে গুঁজে", লেখা বন্ধ রেখে একলা চলবেন এই পথে, একলাই অবতীর্ণ হবেন এই সাধনায়। এমন সময় (১৯০৬ – ১৯০৭ সাল) এগিয়ে এলেন কালী-মোহন ঘোষ; রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর মানবসেবাযজ্ঞে অংশ নেবার জন্য এবং জীবনের শেষদিন (১২ই মে, ১৯৪০) পর্যন্ত রত রইলেন নিরলস সেবাব্রতে।

এখানে দুটো কথা পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষভাবে প্রণিধান করে নিতে হবে। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দেশনায়কদের কর্মপর্ব ও কর্মসূচী ছিল নগরকেন্দ্রিক, রবীন্দ্রনাথের পল্লীকেন্দ্রিক দেশসেবার ডাকে সাড়া দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়, তথাকথিত স্বদেশী ও বিপ্লবীতে দেশ ছেয়ে গেলেও কালীমোহন ছাড়া কেউই পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাননি। অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে ভারতীয়দের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীগ্রামে এবং পল্লীগ্রামের নরনারীদের দুঃখকষ্টের প্রতিকারে একমাত্র কালীমোহনই রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব, এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোন কাজের আমি যোগ্য নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলাম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকে শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্য সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিশের খাতায় তার নাম উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দেবার আগে কালীমোহন পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে পল্লীবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সময় একদা (১৯০৬ সালে) গ্রীষ্মকালে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করতে এসে চমৎকৃত হন কালীমোহনের ক্রিয়াকলাপ দেখে এবং তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান মালখাননগর, চাঁদপুর, হানারচর, বাবুরহাট, হরিণা, ফরকাবাদ, গোবিন্দিয়া, বাজাপ্তি, বাখরপুর, বালিয়া প্রভৃতি গ্রামে। কালীমোহনের অক্লান্ত জনসেবার সঙ্গে নিজেকে

পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলতে না পারলেও ক্ষিতিমোহন তাঁর "সেবা-নিবেদিত" জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে তিনিই তাঁকে প্রথম পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহনের প্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য-অনুরাগ ক্রমশ রবীন্দ্র-অনুরাগে পরিণত লাভ করে, যার দরুন রবীন্দ্রনাথের ডাক শোনামাত্র কালীমোহন সাড়া না দিয়ে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন কালীমোহনকে টেনে নিলেন তাঁর জনসেবার ব্রতে, তখন কালীমোহন টানলেন ক্ষিতিমোহনকে, ক্ষিতিমোহনের ধারণা কালীমোহনেরই সুপারিশক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন।

এবারে দেখা যাক জলকষ্ট নিবারণে রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহনের ভূমিকা কী। জলকষ্ট নিবারণের প্রয়াসে রত হওয়ার আগে কালীমোহন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন গ্রামাঞ্চলের জলকষ্টের স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"...এই যে এরা পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কী প্রতিকারের কোন উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটছে।...কীভাবে কেমন করে এদের এই মরণ-দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।"

জলকষ্ট রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে কষ্ট দিয়েছিল তার দুঃখ বিশেষভাবে মেয়েদের ভোগ করতে হয় বলে। তিনি লিখেছিলেন :

"যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে, তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে—তাই মন্ত্রে আছে : আপো অস্মান মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মত আমাদের পবিত্র করুক।"

কিন্তু আমাদের পবিত্র করার মত স্বচ্ছ নির্মল জল যে সহজলভ্য নয় তা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মাটির ওপরে জলের ধারা বা জলের আধার যে পঙ্কবিলীন ও জীবাণুদূষিত এবং জল বিশুদ্ধরূপে ভূতলেই যে বিরাজমান, তাও জানতেন তিনি। এই ভূতলবিহারী জল সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন :

"...ধরিত্রীর বুকের ভেতরে প্রাণের রসধারা আছে। এই ধারা সর্বত্রই আছে..."

এই ভূ-জল সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন :

"...মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে..."

ভূতল-বিহারী জলকে আয়ত্ত করার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর গানের মাধ্যমে :

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কল্‌কল্ ছল্‌ছল্—
ভেদ করি কঠিনের ক্রুর বক্ষতল কল্‌কল্ ছল্‌ছল্।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল, কল্‌কল্ ছল্‌ছল্।
...মরুদৈত্য কোন্ মায়াবনে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কল্‌কল্ ছল্‌ছল্।

গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে যে পরিকল্পনা ক্রমশ সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য কালীমোহন ঘোষ এগিয়ে এলেন। দেশের কাজে সমর্পিত প্রাণ নেতাদের কাছে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে জনসেবায় দীক্ষা নিলেন কালীমোহন, কারণ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক উচ্চাশাবর্জিত দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আছে। ররীন্দ্রনাথের নির্দেশমত প্রথমে তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র রচনা করলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের যে জনসেবার কাজ ছিল, তাতে তিনি আত্মসমর্পণ করেন সর্বান্তঃকরণে।

সম্প্রতি শ্রী জিতেন সেন রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহনের গ্রামকেন্দ্রিক জনসেবার কথা স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে রাজনীতি ব্যবসায়ীরা (practical politicians) যখন শহরকে কেন্দ্র করে আবেদন নিবেদনের পালা জমিয়ে তুলেছেন, তখন গ্রামাঞ্চলের নরনারীদের দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট হয়ে খাঁটি জনসেবার ক্ষেত্রে দেশের যুবশক্তিকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কালীমোহন ঘোষ। গ্রামের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষদের সঙ্গে এমনি একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন যে সকলকেই তাঁর একান্তভাবে আপনজন বলে জানতেন। শ্রী সেন লিখেছেন, সময়ে-অসময়ে যখনই যে গ্রামে গিয়েই হাজির হয়েছেন কালীমোহন, গ্রামের মানুষরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে ঘিরে ফেলে তাঁর আদেশের অপেক্ষা করেছেন। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের ওপরে তাঁর প্রভাব এমনি গভীর ছিল যে বিনা তর্কে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা সর্বদাই।

জনগণের মনের ওপরে কালীমোহনের প্রভাব এমনি গভীর ছিল যে ইচ্ছে করলে তিনি সর্বজনবরেণ্য জননেতা হতে পারতেন। কিন্তু "গ্রামসেবার কাজেই কালীমোহনের আপন প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র" ছিল, জনসেবার মধ্যেই চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল তাঁর নেতৃত্ব। কালীমোহনের স্মৃতি-চারণা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী লিখেছেন যে, মানবসেবায় আত্মসমর্পিত প্রাণ কালীমোহন ছিলেন সত্যিকারের কর্মযোগী। কিন্তু "কাজের জন্য যতটুকু করা উচিত ততটুকু করিয়া তাঁহার মন মানিত না।"

ক্ষিতিমোহনের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে স্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তির সীমা পেরিয়ে কাজ করতে গিয়ে কালীমোহনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এরপর কালীমোহন অবতীর্ণ হলেন শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায়। শিশুদের শিক্ষার কাজে ব্রতী হয়ে তিনি অনায়াসে জয় করে নিলেন শিশুদের হৃদয়। লোকশিক্ষাব্রতে তাঁর নিষ্ঠা দেখে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে গেলেন য়ুরোপে।

কিন্তু কালীমোহনের প্রধান আকর্ষণ ছিল জনসেবা। য়ুরোপে শিশুশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলেও তাঁর প্রগাঢ় মানবপ্রীতি দিয়ে তিনি বিলাতের বিদগ্ধ সমাজের মানুষদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সহজাত মানবপ্রীতি দিয়ে তিনি বিলেতের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন—এজরা পাউণ্ড, রদেনস্টাইন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ স্থাপিত হয়েছিল।

শিক্ষাব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে এলেও কালীমোহনের মনপ্রাণ জনসেবার দিকেই ঝুঁকে থাকত। তিনি দেশে ফেরার কিছুদিন বাদে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীনিকেতন, শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে মানবসেবার ব্রতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন কালীমোহন—তারপর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠভাবে গ্রামসেবার কাজে লেগে রইলেন। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ভাষায় "এই গ্রামসেবার কাজেই কালীমোহন আপন প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাইলেন। এই কাজে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হইল। বহু স্থান হইতে তাঁহার কাছে গ্রামসেবকরা কাজ শিখিতে আসিতেন।"

এবার দেখা যাক জলকষ্ট নিবারণে কালীমোহনের ভূমিকা কী। প্রথমত জলাভাব নিবারণ। বীরভূমের অধিকাংশ অঞ্চল প্রতি বছরই জলাভাব এবং তার দরুন অন্নাভাবে জর্জরিত হয়। এই জলাভাব নিবারণের জন্য কালীমোহন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং নিশাপতি মাঝির সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি একটি জলাশয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপারে তাঁরা যে আদর্শ দেখালেন তার ফল সুদূরবিস্তৃত হয়েছিল।

"জলোৎসর্গ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ প্রয়াসের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতিগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন...এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা সকলেই জানেন।···এখানে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চারদিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্ত মূর্তি ধারণ করেছিল—আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে···"

দ্বিতীয়ত, মাটিকে মরুগ্রাস থেকে রক্ষা। জলাভাব দূর করার সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচের জলাধারকে অক্ষত রেখে মাটির সরসতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

"এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।···মানুষ অমিতাচারী···মানুষ গৃধ্নু-ভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময় এর এমন দশা ছিল না। এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার ছায়া···"

কবির এই বাণী আকাশের শূন্যমাঝে বিলীন হয়নি। ভূমিকে মরুভূমির আক্রমণ থেকে প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন কালীমোহন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তরুহীনতা মরুভূমির শুধু নয়, বারিপাত হ্রাসেরও কারণ। রবীন্দ্রনাথ "বৃক্ষরোপণ" উৎসবের মধ্য দিয়ে বনভূমি পত্তন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য কালীমোহন গ্রামে গ্রামে বন-রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে—" রবীন্দ্রনাথের এই গানের আবেদনের সার্থক রূপায়ন একমাত্র কালীমোহনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে এ কাজে কালীমোহনকে সাহায্য করেছিলেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায়—তাঁরা দুজনে মিলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৃক্ষরোপণ করেছিলেন।

১৯৪০ সালের ১২ই মে কালীমোহনের জীবনের ওপরে আকস্মিক যবনিকাপাত না

ঘটলে শান্তিনিকেতন কেন্দ্র করে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে সত্যিই হয়তো মরুবিজয়ের কেতন উড়ত। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে আর কেউ এগিয়ে এলেন না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত গ্রামকেন্দ্রিক সেবামূলক কর্মেরও অবসান ঘটে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই।

আজ দেশব্যাপী জলকষ্ট নিবারণের বহু কোটি টাকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কালীমোহনকে বিশেষভাবে স্মরণ করি আমরা। ভূবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিজ্ঞানী এবং বেতনভুক্ত অসংখ্য কর্মী এই কর্মপর্বে নিযুক্ত, কিন্তু জনসেবা জ্ঞানে এই কাজে আত্ম-সমর্পণের মত মানসিক প্রস্তুতি কারুরই নেই। এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলতে হলে কালীমোহনের মত মানুষ চাই, যিনি "নিজের সেবা ছাড়া আর সবারই সেবায় আনন্দ পাইতেন"। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তৎপরতার পাশাপাশি কালীমোহনের আদর্শ-অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবা প্রয়োজন। ভূবিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌রা যে ভূ-জলকে আয়ত্ত করবেন, জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমেই তা সকলের চাহিদা মেটাবে।

॥ এগারো ॥

খনিজের সন্ধানে মাটির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, কারণ মাটি পাথরকে চাপা দিয়ে আছে। ভাল ক'রে মাটি পরীক্ষা করলে মাটির তলার পাথর ও খনিজের হদিস পাওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

ঘাটশিলার আশেপাশে আমি যখন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করছি, তখন সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের নিচে একটি নালার ধারে একজন বৃদ্ধ য়ুরোপীয়ান ভূবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হল আমার। তিনি সেখানে ছোট একটি গাঁইতি দিয়ে মাটি কেটে তার নমুনা ব্যাগে ভরছেন। তাঁর পাশেই পাশাপাশি মাটির নমুনা-ভরা কয়েকটি ব্যাগ সাজানো আছে।

মাটি কাটতে কাটতে বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। নিবিড় নীল তাঁর চোখদুটি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। মাটি কাটা বন্ধ করে এগিয়ে আসেন আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি ইংরেজীতে বললেন, তোমাকে দেখে জিয়োলজিস্ট মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।—আমি বললাম।

—খুব ভাল। তোমার মত একজন ইয়ং জিয়োলজিস্টের কথাই চিন্তা করছিলাম এই মুহূর্তে। চিন্তা করতে করতেই তোমাকে পেলাম, আমার ইচ্ছাশক্তিই যেন তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল।

—বলুন কি করতে পারি আমি আপনার জন্য।

—আমার জন্য কি করতে পার বলার আগে আমার পরিচয় দিই। আমি এই বনেরই মানুষ, বনমানুষ অবশ্য নই···

এই বনের মানুষ আপনি!—আমি অবাক হয়ে বললাম: কিন্তু আপনি তো একজন য়ুরোপীয়ান!

য়ুরোপীয়ান হলেও আমি এই বনেরই মানুষ।—মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বৃদ্ধ বললেন: এই বনেই বাস করি। কাছেই আমার কুঁড়েঘর। আর একটা ঘর আছে টাটানগরের কাছে কুদাদা গ্রামে। মেয়ে ও আমি দুজনে মিলে এখানে খনিজের খোঁজ করছি··· দু-একটি খনিও গড়ে তুলেছি ··আমার নাম ই. এফ. ও মারে···

—আপনি 'মারে'! 'মারে' তো একটি বিখ্যাত নাম।

—বিখ্যাত কি না জানি না, তবে এখানকার বনের হো, সাঁওতাল ও ওঁরাওরা সকলেই চেনে আমাকে। আমার খ্যাতি-অখ্যাতির প্রসঙ্গ থাক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। আমার বিশেষ একটা কাজে তোমার সাহায্য চাই। পাশে ঐ ঝোপের আড়ালে আমার ভ্যান (Van) দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ঐ ভ্যানটা আমার চলমান ল্যাবোরেটারি। চল ওখানে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

মারে-সাহেবকে অনুসরণ করে লাল রঙের ভ্যানের পেছনে গিয়ে হাজির হই। ভ্যানটা অনেক চলমান ডাকঘরের মত দেখতে। ভেতরে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় আয়োজন রয়েছে। লম্বা ডেস্কের ওপরে রকমারি রাসায়নিক পদার্থ, বিকার, টেস্ট-টিউব, গ্যাস-বার্ণার ইত্যাদি সাজানো আছে। মারে-সাহেবের সঙ্গে ভ্যানের মধ্যে ঢুকে ঐ ডেস্কের সামনে দাঁড়াই।

ডেস্কের ওপরে রাখা একটি টেস্ট-টিউব তুলে নিয়ে মারে-সাহেব বললেন, এর ভেতরে তরল পদার্থের দিকে তাকাও।

টেস্টট-টিউব ভর্তি তরল পদার্থের মধ্যে দ্রষ্টব্য কি আছে বুঝতে পারি না। হতবুদ্ধির মত তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?—ধমকের স্বরে বললেন মারে-সাহেব: বল কি দেখছ?

কি আবার দেখব—আমি আমতা আমতা করে বলি: তেমন কিছু দ্রষ্টব্য তো দেখছি না!

—রং দেখছ না? আমার চোখে ছানি পড়েছে বলে এর রং বুঝতে পারছি না। বল কি রং দেখছ?

—নীল রং।

—নীল রং। কি রকম নীল?

—নিবিড় নীল…ডিপ ব্লু…

ইউরেকা, ইউরেকা!—সোচ্ছাসে বলে উঠলেন মারেসাহেব: পেয়ে গিয়েছি… পেয়ে গিয়েছি।

টেস্ট-টিউবে তরল পদার্থের নীল রঙ মারে-সাহেবকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। কিসের আভাস পেয়েছেন তিনি নীল রঙের মধ্যে? প্রশ্নটা করতে গিয়ে থমকে যাই। হয়তো ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। আমার প্রশ্ন হয়তো তাঁকে বিব্রত করবে।

মুখ ফুটে প্রশ্নটা করতে না পারলেও আমার মুখে চোখে সোচ্চার জিজ্ঞাসা মিস্টার

মারের দৃষ্টি এড়ায় না। মৃদু হেসে তিনি বললেন, আমার চোখে ছানি পড়লেও তোমার চোখের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি তো কৌতুহলী হয়ে উঠেছ, তাই না?

হ্যাঁ—আমি জবাব দিলাম : আপনার আপত্তি না থাকলে আমাকে বুঝিয়ে দিন, ঐ নীল রং কিসের আভাস দিচ্ছে।

—নীল রং শুধু নয়, এক একটা টেস্ট-টিউবে এক এক রকম রং। আমার মেয়ে মারিয়া প্রত্যেকটি রং সঠিক সনাক্ত করে টেস্ট-টিউবের গায়ে লিখে রেখেছে। এই নীল রংটা শুধু মারিয়াকে দেখাত পারিনি, কারণ আর এক জায়গায় তার কাজের তাড়া আছে। সে যাই হোক, নীল রংটা তুমি চিনে নিয়ে একটা অসাধারণ আবিষ্কারে সাহায্য করেছ আমাকে।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, হেঁয়ালির মত লাগছে।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন মন দিয়ে···

মারে-সাহেব আমাকে মাটির রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যাপাটা বুঝিয়ে দেন আদ্যোপান্ত।

মাটি পাথরকে চাপা দিয়েছে, পাথর ক্ষয় হয়ে মাটির সৃষ্টি, অতএব মাটি পরীক্ষা করলে পাথরের স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। মাটি থেকে নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষা করলে যে সব ধাতুর সন্ধান পাওয়া যাবে, তারা মাটির নিচে পাথরের মধ্যে আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের তলায় যে মাটি আছে, তা থেকে নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষা করছেন মারে-সাহেব। কুড়ি-পঁচিশ মিটার অন্তর অন্তর দু-তিন কিলোগ্রাম করে মাটি খুঁড়ে থলিতে ভরছেন তিনি। যেখান থেকে মাটি তুলছেন, সেখানে খুঁটি পুঁতে দিচ্ছেন এবং খুঁটির গায়ে নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন। এই একই নম্বর দিচ্ছেন তিনি নমুনা-ভরা থলির গায়ে। এমনি করে মাটির নমুনা সংগ্রহ শেষ হলে পর শুরু করেছেন তাদের নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা। তাঁর মোটর-ভ্যানের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

রাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম ধাপ, মাটির নমুনা অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দ্রবণ তৈরি করা। একটি চীনামাটির পাত্রের মধ্যে এই দ্রবণ তৈরি করা হয়। মাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধাতুকে এ্যাসিডে পুরোপুরি গলিয়ে ফেলার জন্য মাটির নমুনার ওপরে এ্যাসিড ঢেলে তাপ প্রয়োগ করতে হয়। তার জন্য পাত্রটিকে জলন্ত গ্যাস-বার্ণারে বসানো হয়।

মাটি থেকে গলে ধাতু এ্যাসিডে এসে গেলে পর শুরু করা হয় দ্রবণটির রাসায়নিক পরীক্ষা। দ্রবণ থেকে খানিকটা টেস্ট-টিউবে ঢেলে নিয়ে তাতে রকমারি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে, তাতে দ্রবণের রং বদলে যায়।

লাল, ফিকে লাল, হলুদ, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং এক একটি ধাতুর উপস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলে।

সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের নিচে মাটির মধ্যে তামার হদিস মিলেছে। তামার সঙ্গে নিকেল ও লোহা আছে। টেস্ট-টিউবের মধ্যে যে নিবিড় নীল রং দেখেছি, তা কি এই ধাতুগুলির কোনটির উপস্থিতিকে ব্যক্ত করছে?

না।—মারে-সাহেব বললেন: এখানকার মাটিতে তামা ও লোহার উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ সিদ্ধেশ্বর, রোয়ম ও অন্যান্য পাহাড় জুড়ে বিরাজ করছে সিংভূমের তামার ক্ষেত্র। এখানকার মাটির নীচে যে পাথর আছে তাতে তামা থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তামার সঙ্গে লোহা থাকে, অতএব লোহার হদিস পাওয়ার মধ্যে কোন বিস্ময় নেই।

আর নিকেল?—আমি প্রশ্ন করি।

—নিকেলও বিস্ময়কর কিছু নয়। তামার সঙ্গে তার সহাবস্থান জায়গায় জায়গায় ঘটেই থাকে।

—তা হলে টেস্ট-টিউবে নীল রঙের মধ্যে বিস্ময়কর কোন্ বস্তুর হদিস পেলেন?

তুমিই বল না। মারে-সাহেব মৃদু হেসে বললেন: টেস্ট-টিউবের তরল পদার্থের নীল রং দেখে তোমার কি মনে হয়? এ্যাসিডের মধ্যে মাটি থেকে যে দ্রবণ তৈরি হয়েছে, তাতে ফেলিংস সলিউশন (Fehling's Solution) দিতেই এই রং সৃষ্টি হয়েছে। এখন বল কোন্ ধাতু ফেলিংস সলিউশনের সংযোগে নীল রং সৃষ্টি করে?

পারদ।—আমি জবাব দিলাম: তার মানে এখানকার মাটির মধ্যে পারদ আছে?

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে এখানকার মাটির নিচে পাথরের মধ্যে পারদ আছে! অর্থাৎ এখানকার মাটির নীচে পারদের ভাণ্ডার রয়েছে?

—না।

আমি অবাক হয়ে মারে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম: মাটিতে পারদ আছে, অথচ আপনি বলছেন যে মাটির নিচে পারদ নেই!

—না। মারে-সাহেব বললেন, এ পারদ পারদ নয়, সোনার হদিস দিচ্ছে।

সোনার হদিস দিচ্ছে!—আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম: সোনা আছে এখানে?

—এখানকার মাটির সঙ্গে মিশে থাকা পারদ প্রমাণ দিচ্ছে যে এখানে সোনা আছে।

—পারদের সঙ্গে সোনা সহাবস্থান করে বুঝি?

—তা করতে পারে, এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর সহাবস্থান স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু

এক্ষেত্রে তা নয়। বালি থেকে সোনা নিষ্কাশন করার জন্য যে পারদ ব্যবহার করা হয়, এ তারই অবশেষ। অর্থাৎ এখানে নালার বালি ধুয়ে সোনা বের করা হত।

বালি ধুয়ে বালির মধ্যে সোনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার পর পারদের সাহায্যে বালি থেকে সোনা তুলে নেওয়া হয়। এখন আর এখানে বালি থেকে সোনা বের করা হয় না, কিন্তু একদা যে এখানে সোনা আহরণ করা হত, তার প্রমাণ এখানকার ধুলোমাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। টেস্ট-টিউবের তরল পদার্থের নীল রং তাকে প্রকট করে তুলেছে আমাদের চোখের সামনে।

॥ বারো ॥

মাটির নিচে পাথরে প্রছন্ন খনিজের সন্ধান নেওয়া হচ্ছে ভূবিজ্ঞানীর কাজ। কিন্তু খনিজ খুঁজতে গিয়ে আর কিছু খুঁরে বের করার তাগিদ মাঝে মাঝে এসে যায়। আমি ও আমার সহকর্মী বিষেণলাল যোধপুরের (রাজস্থান) কাছে তেওরি গ্রামের পশ্চিমে মরুভূমির মধ্যে বালি-চাপা সীসা-দস্তার ভাণ্ডার খুঁজতে গিয়ে বালি-চাপা মদনমোহনের মূর্তির সন্ধান নিতে বাধ্য হয়েছিলাম তেওরির একজন বৃদ্ধ জোতদারের অনুরোধে। নাম তাঁর যুগলকিশোর। বহু বছর আগে ভূমিকম্পের ফলে যুগলকিশোরের ঘরবাড়ি ও মদন-মোহনের মন্দির ধুলিসাৎ হয়, মদনমোহনের মূর্তি বালিতে চাপা পড়ে যায়। ঘর-বাড়ি ও মন্দির নতুন করে গড়ে তুললেও এই মূর্তি উদ্ধার করা যায় নি। যুগলকিশোর আমাদের কাছে এসে এই মূর্তিটিকে খুঁজে বের করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বললেন, সীসা-দস্তার সঙ্গে মূর্তিটাকেও খুঁজে বের করুন পাথরসাহেব।

খুঁজতে শুরু করি আমরা। সীসা-দস্তা-রূপোর গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য বালির সমুদ্রের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি। যতদূর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে কোয়ার্টজাইটের ঢিবি চোখে পড়ছে। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় কাঁটাঝোপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে দিশেহারা হয়ে পড়ি। বালির মধ্যে এমন কিছু নেই যা দেখে বালির নিচে চাপা-পড়া ধাতুর আভাস পেতে পারি।

বিষেণলাল বলেন, এইভাবে খুঁজে লাভ কি বল। বালি শুধু বালি…

ঠিক বলেছ।—আমি বললাম, বালি শুধু বালি দেখে জান কালি হয়ে গিয়েছে। ভেতরের খবর নেওয়া দরকার। আন্দাজে খোঁড়াখুঁড়ি করে লাভ নেই, জিয়োফিজিক্যাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।

জিয়োফিজিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে রকমারি যন্ত্রপাতি আনতে হবে। এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটিতে কৃত্রিম ভূ-কম্পন সৃষ্টি করতে হবে, মাটির মধ্য দিয়ে চালনা করতে হবে বিদ্যুৎ বা চৌম্বকশক্তি। তারপর বিশেষ ধরনের গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে। কৃত্রিম ভূ-কম্পন, বিদ্যুৎ ও চৌম্বকশক্তি মাটির নিচে লুকানো কোন ধাতুতে প্রতিহত হলে এই গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে সাড়া জাগবে।

কিন্তু এ জাতীয় কাজের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। আপাততঃ বালি দেখা ও পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঝুঁকে পড়ে বালি পরীক্ষা করি, বালির রঙ দেখি, কয়েক মিটার অন্তর অন্তর বালির নমুনা তুলে এনে আমার ছোট্ট পোর্টেব্‌ল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি। টিনের পাত-বসানো কাঠের বাক্সের মধ্যে এই ল্যাবরেটরিটাকে তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের চীফ কেমিস্ট ডঃ চৌধুরী। তার মধ্যে রকমারি রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আছে টেস্ট-টিউব, বিকার, ফানেল ও কেরোসিন বার্নার। তা ছাড়া আছে ছোট কাঠের ডেস্ক। এই ডেস্কের ওপরে বার্নার জ্বালিয়ে ছোটখাট রাসায়নিক পরীক্ষা করা যায়। বালির নমুনা তুলে এনে এখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করি। টেস্ট-টিউবে বালির নমুনা রেখে তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ ঢেলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি, রঙ দেখি। এমনি করে বোঝার চেষ্টা করি কোন ধাতুর লক্ষণ ফুটে উঠছে কি না।

পর পর অনেকগুলো বালির নমুনা পরীক্ষা করি, কিন্তু ছিটেফোঁটা ধাতুরও কোন হদিস মেলে না। হতাশ হবার মতই অবস্থা হয় আমাদের, কিন্তু হতাশ আমরা হই না, কারণ বিজ্ঞানীর হতাশ হতে নেই।

পাঁচ দিনে একশোটা বালির নমুনা পরীক্ষার সেঞ্চুরি যখন করতে বসেছি, তখন বিষেণলাল বললে, আর এখানে কেন, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

না।—আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, এখানে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে আরও অন্ততঃ পক্ষে একশোটা বালির নমুনা তুলব আমি…

বার বার একশো বার বিফল হয়েও নতুন উৎসাহে আমি বালি পরীক্ষা ও নমুনা তোলা শুরু করি। সেদিন যুগলকিশোরের হাবেলি থেকে অনেকটা দূরে এসে যখন বালি পরীক্ষা করতে শুরু করেছি, তখন সূর্য মাথায় উঠেছে। প্রখর রোদে বালি ঝলমল করছে, তার দিকে তাকানোই যাচ্ছে না। এমন সময় ঘটল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। চোখ ধাঁধানো জৌলুসের মধ্যে একটি নিষ্প্রভ বৃত্ত দেখা দিল, চোখ ঝলসানো বালির কপালে যেন টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার কাছে গিয়ে দেখি, এখানে বালির রঙ বদলেছে, উজ্জ্বল সাদা রঙ ফ্যাকাসে বাদামি রঙে পরিণত হয়েছে। এই বাদামি রঙের বালির নমুনা তুলে নিয়ে একটা থলির মধ্যে ভরে ফেলি।

হাবেলিতে ফিরে এসে যুগলকিশোরকে প্রশ্ন করি, বলতে পারেন ভাইসাহেব, মদনমোহনের মূর্তিটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরী ছিল?

পিতল।—যুগলকিশোর জবাব দিলেন, ক্ষেত্রীর পিতল দিয়ে মূর্তিটা গড়িয়েছিলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।

বালির নমুনাটিকে আমার পোর্টেব্‌ল্‌ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি। তার মধ্যে তামা ও দস্তা দুটি ধাতুরই অস্তিত্বের আভাস পাই। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতল তৈরি হয়। নিঃসন্দেহে মদনমোহনের মূর্তি থেকে তামা ও দস্তা ক্ষয় হয়ে বেরিয়ে এসে বালির রঙকে বাদামি করে দিয়েছে।

পেয়েছি।—যুগলকিশোরকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, মদনমোহনের মূর্তি কোথায় আছে তার সন্ধান পেয়েছি।

তাই নাকি!—রুদ্ধশ্বাসে বললেন যুগলকিশোর। তারপর বিযেণলাল ও আমার সঙ্গে এলেন তিনি সেই জায়গাটিতে, যেখানে বালির সাদা রঙে বাদামি ছোপ পড়েছে।

আমি বললাম, এখানে খুঁড়লেই মদনমোহনকে পাওয়া যাবে।

বাদামি রঙের বৃত্তটির দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুগলকিশোর বললেন, তোমরা ঠিক জান যে এখানে খুঁড়লেই মদনমোহকে পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ। এই বালির মধ্যে যে তামা ও দস্তা পেয়েছি, মদনমোহনের মূর্তিই তার উৎস। আমার ধারণা মূর্তি থেকে ক্ষয় হয়ে তা বালিতে মিশে এই বাদামি রঙ সৃষ্টি করেছে।

খোঁড়াখুঁড়ি করতেই বেরিয়ে আসে মদনমোহনের মূর্তি।

সমারোহের সঙ্গে মন্দিরে তাকে প্রতিষ্ঠা করলেন যুগলকিশোর।

॥ তেরো ॥

ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যা লিখেছি তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে খনিজের খোঁজে সাধারণ মানুষদের অবদান ভূতাত্ত্বিকদের তুলনায় কম না। যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে তার সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খনিজ খুঁজে বের করা শুধু নয়, মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন শিলাস্তরের রহস্যভেদ করতে সক্ষম।

সহজাত অন্তর্দৃষ্টি মানুষের চোখের দৃষ্টিকে ছাপিয়ে তাকে তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। উড়িষ্যার অন্তর্গত বড়বিলে এক দৃষ্টিহীনাকে তার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে চক্ষুষ্মানের চেয়েও তীক্ষ্ণতরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেখেছিলাম। সেখানে একটি ম্যাঙ্গানিজের খনিতে সে দশ-বারোজন আদিবাসী মুণ্ডা যুবতীর সঙ্গে বসে খনি থেকে খনন করে আনা ম্যাঙ্গানিজযুক্ত খনিজের পিণ্ডগুলোকে গুণানুসারে সাজাচ্ছিল। চোখে না দেখতে পাক, হাত দিয়ে ছুঁয়েই সে বুঝতে পারছিল খনিজের টুকরোগুলোর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ। তার পাশাপাশি যারা ছিল, তাদের চেয়েও বেশী চক্ষুষ্মান বলে মনে হচ্ছিল তাকে, কারণ পাথর বাছাইয়ে তার দক্ষতা আর সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

বলা বাহুল্য যুবতীটির অন্তর্দৃষ্টি তার চোখের দৃষ্টির জায়গা নিয়েছে। অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে চোখের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা নেই, চোখের দৃষ্টিতে যত দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী দেখা যায় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সূত্রে বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে করতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক মানুষেরই দেখা পেয়েছিলাম, যাদের পর্যবেক্ষণশক্তি আমাদের গতানুগতিক চোখের দৃষ্টিকে ছাপিয়ে যায়। একদা বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়গপুর পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে বক্সাইট নামক খনিজের সন্ধান নিচ্ছিলাম। সেখানকার বাসিন্দা হল কোঁড়ে, কোল ও সাঁওতাল। বনের পশুদের সঙ্গে সহজ সহাবস্থানে বনের সঙ্গে মিশে আছে তাদের অস্তিত্ব। বনের মধ্যে বিচরণ করতে করতে তাদেরও চরণরেখা পড়ে নি এমন সব জায়গায় যেতে হচ্ছিল আমাকে। সঙ্গে আমার মানচিত্র ছিল, ছিল দিগ্‌দর্শক কম্পাস, তবু বনের গহনে দিগ্‌ভ্রান্ত হচ্ছিলাম প্রায়ই। কাজেই গ্রামের আদিবাসিদের মধ্যে দিগ্‌দর্শকের সন্ধান করলাম, বন-পাহাড়ের জটিলতার মধ্যে যে আমাকে সঠিক পথ দেখাবে।

সন্ধান করতে এগিয়ে এল একজন। গায়ের রং নিকষ কালো, আকারে বেঁটেখাটো, চ্যাপটা মুখ, কিন্তু অপরূপ বলিষ্ঠ তার দেহের গড়ন। দেহটা যেন তার কালো পাথর কুঁদে গ'ড়ে তোলা হয়েছে। পরনে তার একখানি কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই।

লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগল। তাকে প্রশ্ন করলাম, কি নাম তোমার?

বন্ধু। —লোকটা জবাব দিল, "বন্ধু কোঁড়ে" আমার নাম।

বুঝলাম, লোকটা "কোঁড়ে" সম্প্রাদায়ের—নাম তার "বন্ধু"।

নাম তার "বন্ধু", তার আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে খাঁটি বন্ধুত্ব। আমাকে সে অভয় দিয়ে বললে, আমি এখানকার বন-পাহাড় সব চিনি, যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন, নিয়ে যাব।

সত্যিই নিয়ে যায় সে আমাকে বনের সর্বত্র। বন্ধুকে অনুসরণ ক'রে বনের মধ্যে পথ চলতে চলতে দেখি যে বন্ধুর দিক্ জ্ঞান কম্পাসের মতই সূক্ষ্ম। যেদিকেই ওকে যেতে বলি না কেন, সঠিক সেই দিকেই চলে সে। কম্পাস দিয়ে যাচাই ক'রে দেখতাম যে চলতে চলতে নির্দিষ্ট দিক থেকে এক চুলও স'রে আসছে না সে। যেন একটি জীবন্ত কম্পাস।

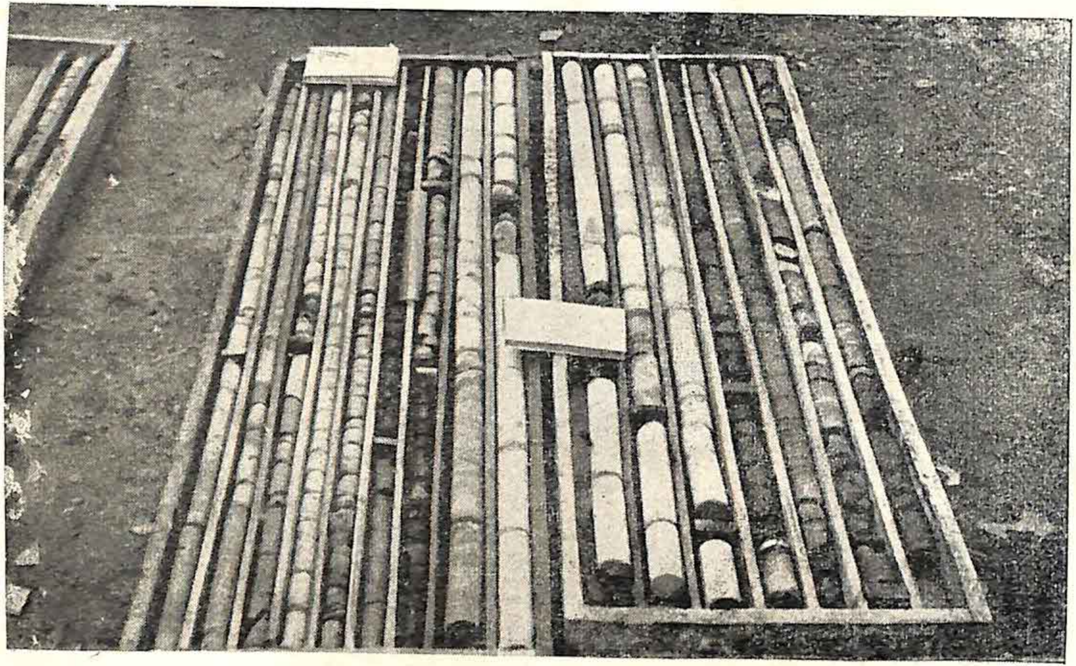
বন্ধুর নির্ভুল দিগ্‌দর্শন আমার বনের মধ্যে পথ চলাকে সহজ ও রমণীয় করে তোলে। সে আমাকে বন-পাহাড়ের দুর্গমতার মধ্যে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায়, যে সব জায়গায় ইতিপূর্বে ভূতাত্ত্বিকদেরই পায়ের চিহ্ন পড়ে নি।

তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমি সারাঙ্গা, খাপরা, ময়রা, মারুক, গড়িয়া প্রভৃতি পাহাড়ের ওপরে এ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত বক্সাইট আবিষ্কার করি।

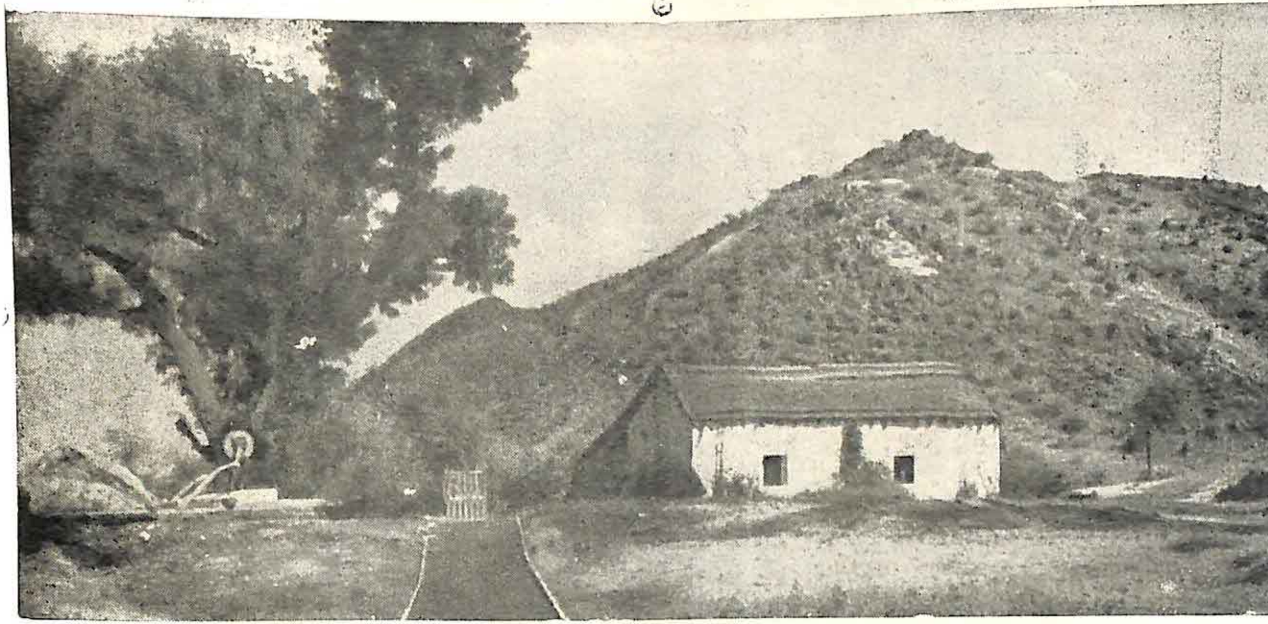
'বন্ধু'র মত আরও অনেক বন্ধুকে পেয়েছি, যাদের সাহায্যে বিনা আয়াসে বন্ধুর পথ অতিক্রম করেছি। আমার মত অন্যান্য ভূবিজ্ঞানীও 'বন্ধু'র মত বন্ধুলাভ করেছেন তাঁদের ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমার ক্ষেত্রে। ভ্যালেণ্টাইন বল্ নামে জনৈক ইংরেজ ভূবিজ্ঞানী লিখেছিলেন, "বনের মধ্যে বনের মানুষদের বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম বলেই ভারতের বনে বনে কাজ করতে পেরেছি।"

উনিশ-শো পঞ্চাশ সালে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন সম্পদের সন্ধান শুরু করেছিলাম বিভূতিভূষণের প্রেরণায়। প্রকৃতিপ্রেমিক কথাসাহিত্যিকের প্রেরণায় যার সূত্রপাত, তা একটানা বহু বছর ধরে চালিয়ে যাবার উৎসাহ পেয়েছি আমার দেশের মাটির মানুষদের কাছ থেকে। মাটির কাছাকাছি থেকে মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ তারাই আমাকে করিয়ে দিয়েছে। তাদের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি আমাকে মাটির আবরণ ভেদ করে মাটির নীচের রহস্যভেদে সাহায্যকরেছে। তারা লেখাপড়া জানে না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার ধারে না, কিন্তু ভূবিজ্ঞানে তাদের সহজাত জ্ঞান নিয়ে তারা আমার গুরুর স্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের জনৈক বাউলের প্রতিধ্বনি ক'রে তাঁদের উদ্দেশে আমার বন্দনা জানাই:

"ও আমার সঠিক গুরু বেঠিক গুরু
গুরু অগণন···



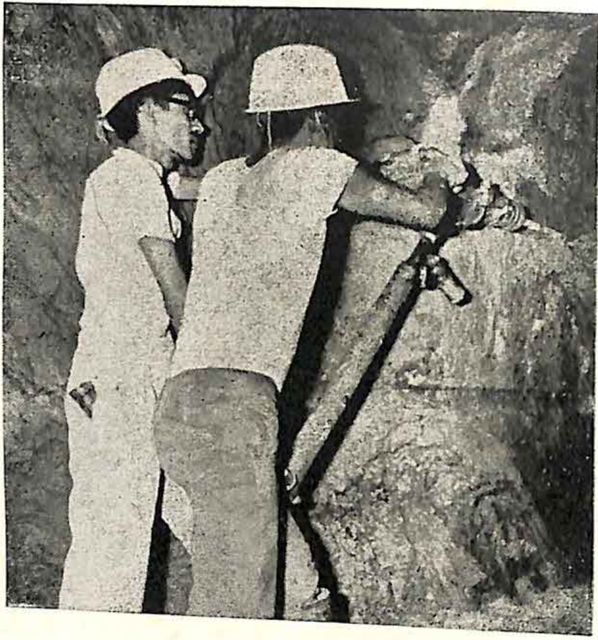
ড্রিল্ করে বের করা পাথর ও খনিজের নমুনা



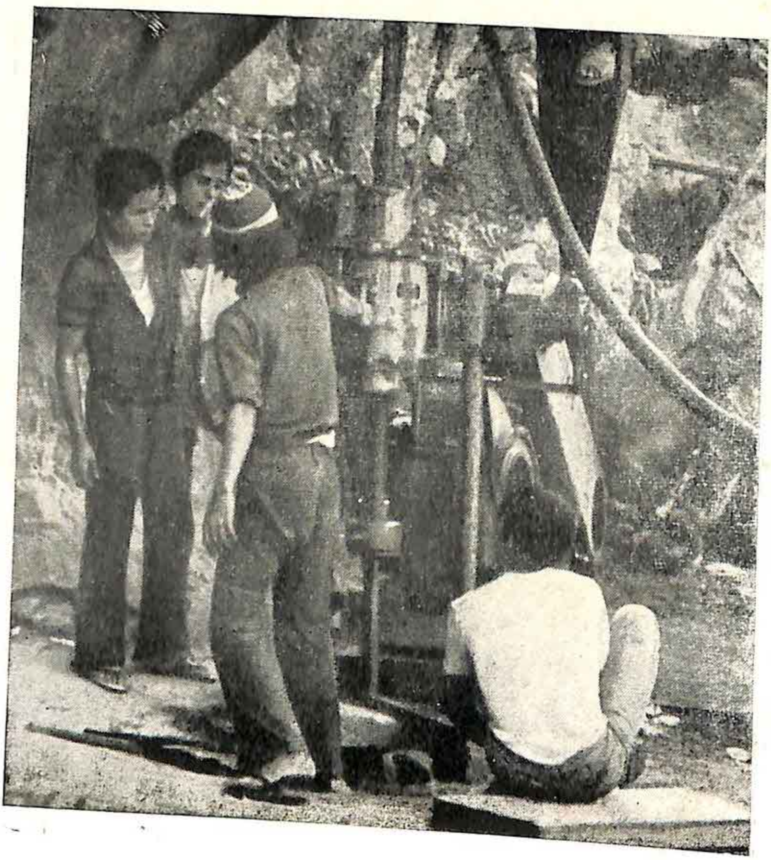
খেতরিতে তামার পাহাড়



খনিজের খোঁজে খোঁড়াখুড়ি



তামার খনির সুড়ঙ্গ



পাথরের স্তর ভেদ করে ড্রিলিং

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০
৮। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৬·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ/১২·০০
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯ ০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক/১২·০০
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সঙ্কর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪ ০০
২৩। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০

সাত টাকা